CHANDER MOHUABONE

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED

MATERIAL

চাঁদের মহুয়াবনে

গার্গী ভট্টাচার্য

ভ্রমণ ওড়না জড়ানো,

সারাবিশ্ব ঘোরা সেজদি কে

(ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য)

এই বইতে, ক্লাব মহিন্দ্রার ম্যাগাজিন হ্যালো ও আন্তর্জাল থেকে অনেক ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে আমি জায়গা মতন ব্যবহার করেছি যার জন্য তাঁদের কাছে ঋণী ও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি- ।

লেখক বুদ্ধদেব গুহ ও ভ্রামণিক ডঃ অসীম গুপ্তকে প্রণাম জানাই ।

প্রথমজনের প্রকৃতি নিয়ে লেখা সাহিত্য, আমার ইট কাঠ কংক্রিটের শহরে বেড়ে ওঠা মনে প্রকৃতি প্রেমের উৎস হয় ও দ্বিতীয়জন আমাকে ভ্রমণ লেখায় উৎসাহিত করেছিলেন বলেই আজ এই বই সম্ভব হল ।

এছাড়া বহু লোকাল মানুষ, আমাকে অনেক ছোট খাটো তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন - যাঁরা কৃতজ্ঞতা না জানালেও আমাকে কখনো আইনি উপায়ে শাস্তি দেবেন না তবুও তাঁদের কথা না উল্লেখ করলে আমার ঠিক ভালোলাগছে না । কাজেই তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই ।

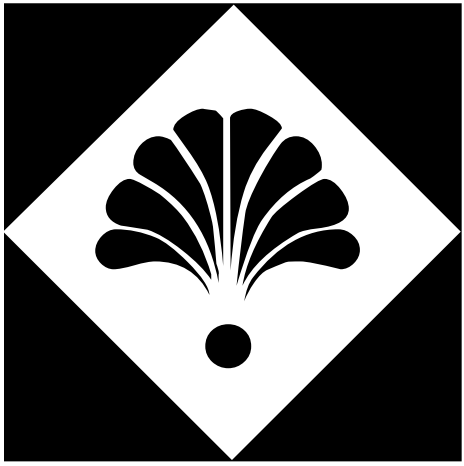

কোডাই পাহাড়ের পথে পথে

দ্রাবিড় সুন্দর, ভয়ঙ্কর সুন্দর কোডাই পাহাড়ের উচ্চতা ৬,৮৫৪ ফিট কোথাও প্রায় ৮০০০ ফিটের কাছাকাছি। নিছকই পাহাড়, পর্বত নয় তাই বরফের লেশমাত্র নেই। ঝর্ণা আছে, অর্কিড আছে, নাম না জানা ফুলের মেলা আছে। আর কি আছে ? পাহাড়ের মন মাতানো গন্ধ ! যা নাকে চোখে মেখে ভ্রমণ পিয়াসীরা হয়ে ওঠেন প্রকৃতি প্রেমে পাগল।

ব্যাঙ্গালোর থেকে একটি তিনতারা হোটেলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বুকিং সেরে গিয়েছিলাম। হোটেলটি মূলতঃ কাঠের, কিছুটা পাথরের কন্সট্রাকশন। পেছনের জানালা দিয়ে চমৎকার উপত্যকা দেখা যায়, ফুলে ফুলে ঢাকা বনপথ। দিনের বেশির ভাগটা আমি জানালায় বসেই কাটিয়ে দিতাম, গুনগুন করে হয়ত বা গাইতাম দু এক কলি –

পাহাড় পাহাড় পাহাড় পাহাড়, চারধারেতে পাহাড় !

দক্ষিণ দেশে দীর্ঘদিন বাস করে আমার দুটো স্বভাব মজ্জাগত হয়ে গেছে। প্রথম হল আমি পোঙ্গলের (ওদের প্রায় গলিয়ে ফেলা এক খিচুড়ি, গোলমরিচের আধিক্যের জন্য আমি বলি পোঙ-গোলমরিচ) বড় ভক্ত হয়ে পড়েছি আর দ্বিতীয় হল সব কথায় টি এর জায়গায় টি-এইচ দিতে শুরু করেছি। টি টা আজকাল ট ট মনে হয়। নমুনা : অনিতা হবে আমার কলমে Anitha --- মানুষ হাসে বিশেষ করে বাংলার মানুষ। সে হাসুক। কেউ তো রামগরুরের ছানা নয় !

যাইহোক সেদিন রাতে আমি পোঙ- গোলমরিচ খেয়ে ডিনার সারলাম।রাতগুলো হিমশীতল। চেয়ার, টেবিলগুলো যেন এক একটা বরফের চাঁই। তামিলনাড়ু রাজ্যে অবস্থিত কোডাইকানাল কথার অর্থ জানা গেল : 'The Gift Of forest'

এখানে বেশির ভাগ মানুষই তামিল সম্প্রদায়ের, ইংরেজীটাও ভালই চলে। হিলস্টেশানের প্রবেশ পথেই একটি দৃষ্টি নন্দন ঝর্ণা, নাম সিলভার কাস্কেড। প্রচন্ড গতিতে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বয়ে চলেছে। দুধ সাদা, ফেনিল জলরাশি। কি তার গর্জন ! যেন সমুদ্র কিনারে আছি ! সফেন সতেজতায় আমি ডুবে যাই, মনের গহীনলোকে। তরলিত চন্দ্রিকা লাস্যময়ী, আছড়ে পড়ছে সবুজ শ্যাওলা মাখা রেলিংয়ের ধারে। তারা আকৃতির কোডাই লেক উপছে পড়ে এই পথে, রূপের ছটায় আহা, মরে যাই !

মাদুরাই এর কালেকটর Sir Vere Levinge এর সৃষ্ট এই জলাশয় পূর্বে ছিল এক জলাভূমি। আলেয়ার দেশ। আজ পাইন ইউক্যালিপটাসে মোড়া এই লেকে নৌকা বিহার হয়।

পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটি দীর্ঘ পথ, সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। কোকার্স ওয়াক। ১৮৭২ সনে তৈরি এই এক কিলোমিটার পথটি সর্পিলভাবে পাহাড়কে আলিঙ্গন করে আছে। সেখান থেকে পাহাড়ের নানা বাঁকে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখা যায়। খুব উপভোগ্য সেই সৌন্দর্য্য। মনে মনে কোন কোন ট্যুরিস্ট হয়ত বা গেয়েও ফেলেন – এই পথ যদি না শেষ হয় তবে ভালই হত। কোকার্স ওয়াকে ঢুকতেই বাঁ হাতে একটি অপরূপ গির্জা। ধূসর রং, বাদামী ছাদ। খুব সুন্দর তার স্থাপত্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যর সুচারু মেলবন্ধন। দুই পাশে বেগুণী ও সিঁদুর ফুলে ছেয়ে থাকা পাতাঝরা মহীরুহ। চোখ জুড়ানো। মন ভরানো। Bryant's Park, শহরের কেন্দ্রস্থলে। ৭০০ প্রজাতির গোলাপের সঙ্গে আছে দেড়শো বছরের পুরনো ইউক্যালিপটাস বৃক্ষ।

কুরুঞ্জি আন্দাওয়ার মন্দিরে পুজিত হন কার্তিক, পাহাড়ের দেবতা হিসেবে। সেখানে ফোটে কুরুঞ্জি পুষ্প, ১২ বছরে মাত্র একবার। তিনটি গ্রানাইট প্রায় ৪০০ ফিট উঁচু, হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। জায়গাটি পিলার্স রক। প্রকৃতির ভাস্কর্য নয়নাভিরাম। যেন ছেনি হাতুড়ি ব্যাতীত এই অনবদ্য স্থাপথ্যের সৃষ্টি হয়েছে, অদৃশ্য বাতাসের গুঞ্জনে।

পাহাড়ি পথ সুন্দর, ঘন বৃক্ষের ছায়ায় প্রাণ জুড়ায়। লাল লাল পাহাড়ের গায়ে হালকা সবুজ ফার্ণ তাতে প্রজাপতি রঙা অর্কিড। অনাদরে প্রস্ফুটিত, যেন বিকশিত হয়েই তার আনন্দ।

অনতিদূরে আছে ঘন অরণ্য। সেই সবুজ বনানীর কোলে আছে একটি প্রাকৃতিক জলাশয়। বনজ ভয়ানক মাকড়সা এক যাতনা। শুনলাম এই অঞ্চল মাকড়্সাদের রাজত্ব। মানুষই অনাদৃত।

জঙ্গলে ঢুকতে গেলে বিশেষ অনুমতি লাগে। সেই অনুমতি জোগাড় করার জন্যে বিশাল লাইন পড়ে। মাত্র কয়েকজনের অনুমতি মেলে। তাই সবার এত তাড়া। আমরাও ভেজা ভেজা পাইনের ছায়া মাখা পথ ধরে প্রবেশ করলাম সেই অরণ্যে। লাল মাটি ও সবুজ সবুজ বন একটা অপূর্ব কন্ট্রাস্ট এনেছিল যা যেকোন অলোকচিত্রীর কাছে পরম লোভনীয় সাবজেক্ট। আমি পেশাদার না হলেও নেশাদার। মুহূর্তে ক্যামেরাবন্দী করে নিলাম সেই অনাবিল সৌন্দর্য্য।

যথেষ্ট দৌড়াদৌড়ি করে বনে যাবার অনুমতি মিলেছে। কোন এক বড় কর্তা এসেছেন সপরিবারে বনভ্রমণে। বার কয়েক তাঁদের জীপকে পাশ কাটালাম।

বনপথে, যেতে যেতে একটি অদ্ভুত সুন্দর ব্যাঙের ছাতা নজরে পড়লো। লালের ওপরে কালো ছিট্ছিট্, ছোটবেলায় লেডি বার্ডের বইতে পড়া গুবরে পোকাটার পিঠের মতন নকশা করা। আকারেও বেশ বড়। ঝট্ করে ছবি তুলে নিলাম কিন্তু সেরকম পরিষ্কার এলোনা ছবিটি। জঙ্গলে বন্য প্রাণীর ভয়ে একদল বুনো মানুষ, যারা ওখানে ছোট ছোট ঘরবাড়ী বানিয়ে থাকেন তারা সবাই বিকেল ৪ টের সময় দরজায় খিল এঁটে দেন। আমরাও তাই বেশি দেরী না করে সেই নিভৃত জলাশয়ের মনোরম শোভা উপভোগ করে ফিরে এলাম শহরে।

হোটেলের মুখে একটা স্টল থেকে মোটা মোটা হালকা সবুজ পাহাড়ি লঙ্কা ভাজা খেয়ে মনটা ফুরফুরে হয়ে গেল। অনেকটা ক্যাপসিকাম এর মতন সুগন্ধ কিন্তু দেখতে বাঙালী লঙ্কার জেষ্ঠ্য ভ্রাতা।

চললাম লেক অভিমুখে । খোদ শহরের একটি লেক আছে নৌকা ক্লাব আছে, সেখানে বোটিং এর ব্যবস্থা আছে । লেকটি নি:সন্দেহে সুন্দর কিন্তু বড় কৃত্রিম । প্রকৃতির কোলে এই কৃত্রিমতা বড়ই বেমানান লাগে । জমজমাট জায়গা, হৈ হুল্লোড় ভালো লাগেনা । নিরিবিলিতে কটা দিন কাটাতেই তো আসা । মানুষ তো অনেক দেখি!

দাও ফিরে সে অরণ্য লও হে নগর !! দিন তার ঘুমের রেশ কাটালে কখনো কখনো যখন প্রকৃতির কোলে হারিয়ে যেতাম তখন মনে হত মাকড়্সা রাজ্যে শিশিরবিন্দু ভরা প্রকৃতি, খুশীতে মুক্তোর নেকলেস পরে সেজেছে । হয়েছে অপরূপা । লোভ হয়, খুব লোভ হয় তার ভয়ংকর সৌন্দর্য্যের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিতে । মনে হয় চুলোয় যাক সভ্যতা, কৃষ্টি আমি সৃষ্টির আদিমতায় অবগাহন করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিইনা কেন ! কিসের তাড়া আমার ?

দক্ষিণ ভারতের পাহাড়ি এলাকায় একটা জিনিস আমাকে ভারি আনন্দ দেয় । এখানে হিমালয় থেকেও নেই । উঁচু পাহাড়, ঝর্ণা, চা- কফি বাগিচা, ঘোড়া, হিম শীতল আবহাওয়া সবই আছে নেই শুধু নাক চ্যাপ্টা মানুষ, বদলে ঘনশ্যাম, চওড়া ছাতি কিংবা মাথায় ফুল গোঁজা দ্রাবিড় শাম্বোষ্ঠি । ভারি মজা লাগে । ভারতের দুই প্রান্তে দুই পাহাড়ে একেবারে দুই ভিন্ন ধরণের সংস্কৃতি ।

কোডাই কানালে প্রচুর সাহেব কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস করেন । দু একজনের সঙ্গে আলাপ হল । বেশি ভাগের নেশা অর্কিড ও ঘোড়া । জানা গেল আমার শহর ব্যাঙ্গালোরের অধিকাংশ জকিই নাকি এই অঞ্চলের বাসিন্দা । অনেকে অশ্বচালনার জন্যে নানা পুরস্কার পেয়েছেন । পিটার নামক এক ইউরোপিয়ান ব্যাক্তির সংগ্রহে প্রচুর অর্কিড দেখলাম । স্যান্ডির নেশা ছবি । একের পর এক পেন্টিং করে যাচ্ছেন । সব মন ভালো করা ছবি । প্রতিটি রং, প্রতিটি স্ট্রোক কথা বলছে । আমার মতন ছবি পাগলের মনে নেশা ধরায় ।

ব্যাঙ্গালোরে ফেরার আগের রাতে ছিল পূর্ণিমা । আমি কোনদিন পাহাড়ে পূর্ণচন্দ্র দেখিনি । পতিদেবকে মনবাসনাটি জানাতেই সবুজ সংকেত

মিললো । চাঁদ দেখতে সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে - সেই রাতে রাত ছিল পূর্ণিমা, রং ছিল ফাল্গুনি হাওয়াতে গাইতে গাইতে চলে এলাম হোটেলের লনে । কিন্তু কুয়াশার চাদরে ঢাকা কোডাই পাহাড় আমাকে নিরাশ করলো । তবু গেয়ে উঠলাম - মন খুশি উর্বশী এই রাতে ----- !! নাই বা দেখা গেল চাঁদ তবু তো আজ পূর্ণিমা । রোমান্টিক মনের মানুষেরা রঙীন জোছনায় না খুশি হয়ে পারে ?

ছায়াহিম রাতে জোনাকির খেলা দেখতে দেখতেই কেটে গেলো সময় ।

মনে মনে চাঁদ দেখা সেরে ফিরে এলাম নিজ কুটিরে । অসম্ভব ঠান্ডা সেদিন । ঘরে রুম হিটার চালাতে হয়েছে । এককাপ ধুমায়িত কফি নিয়ে পারিবারিক আড্ডায় মেতে উঠলাম । পরের দিন ফেরার পালা, যদিও ফিরতে ইচ্ছাই করেনা । ভোর হতে না হতেই গাড়ি রেডি । ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, প্রাণ ভরে বনফুলের গন্ধ নিয়ে গাড়িতে চড়ে বসতেই দেখি একখানা মেঘে ভেসে যাচ্ছে । চোখাচোখি হতেই দুষ্ট হেসে বললো :: আবার এসো কন্যে !

পাল্টা হেসে বললাম - তুমিও সময় করে যেও আমার দেশে,মেঘবার্তা পাঠিয়ে করে গেলেম নিমন্ত্রণ ।।

ডুলুং তীরে কনকদুর্গা

৭০ দশকের কোন এক সময় । একবার শীতের ছুটিতে আমরা সাতজনের একটি বিরাট দল মিলে বেড়াত গেলাম মেদিনীপুরর ঝাড়গ্রামের কা ছে 'গিধনি' না মে একটি ছোট্ট জায়গায় । বি- শেষত্ব বলতে জলহাওয়া ভালো, শান্ত পরিবেশ, শহরের কল্লোল থেকে দূরে । কলকাতা থেকে মাত্র ঘন্টা খানেক দুরে এই আদিম পরিবেশে দু চার দিন ঘোরার পক্ষে একদম আদর্শ । এখন অবশ্য এই জায়গা মাওবাদীদের কবলে । যাইহোক একদিন খুব ভোরে আমরা রওনা হলাম । গিধনিতে একটি মাত্র আশ্রম আছে বা তখন ছিল। সেখান থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হল ।

আজও মনে পড়ে শীতের রাতে ঠকঠ্ক করে কাঁপতে কাঁপতে প্রায় দশ মিনিট হেঁটে খেতে যাওয়া, আশ্রমের ডাইনিং হলে । সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বটে । নিদারুণ শীতে পাথরের মে- ঝেতে বসে কোনো ভাজা ফাজা ছাড়া শুধু গরমাগরম খিচুরি খাওয়া এক মনে রাখার মতন ঘটনা । সেই প্রথম শালপাতায় - খেয়েছিলাম । বেশ লাগছিল কিন্তু !

এই আশ্রম থেকে কাছাকাছির মধ্যে আছে ' চিলকিগড় ' । ১৫/১৬ কিমি হবে হয়ত । কিছু কমবেশিও হতে পারে । আমরা গরুর গাড়ি করে যাবো ঠিক হল । ছেলেবলায় মানুষের উচ্ছ্বাস - বেশি হয় । গরুর গাড়ি চড়বো বলে আগের দিন রাতে ঘুম'ই হল না । সারারাত জাগা- শুধু প্রতীক্ষা করছি, কখন ভোর হবে । - ভোর হতেই এক ছু ট্টে তৈরি হয়ে নিলাম । অন্য সময় পেছনে ঘ্যানঘ্যান করতে হত । যাইহাক যথাসময় এক লাফ --গরুর গাড়িতে চেপে বসলাম ।

উহ ! ভাবলে এখনো গায়ে রীতিমতন কাঁটা দেয় । দুটো গরুর গাড়ি করে আমরা রওনা দিলাম চিলকিগড়ের উদ্দেশ্যে ।

কনকদুর্গা মন্দির দেখবো বলে ।শালপিয়াল বনের মধ্যে দিয়ে ভাঙা ভাঙা পীচ রাস্তা । দুপাশে অজস্র কাজু গাছ ।

বেশ সুন্দর পথ । গরুর সওয়ারি তো, তাই প্রতিটি ফুল, পাতা, প্রজাপতি গুনতে গুনতে চলেছি । সে এক অনবদ্য যাত্রা ।

'গাড়ি চালায় বংশীবদন সঙ্গে যে যায় ভাগ্নে মদন ' -

নাহ্ ! এই যাত্রায় ে কানো মদন ছিলনা আমাদের সঙ্গে । বংশীবদন একাই আমাদের নিয়ে গেল চিলকিগড় । ঘনঅরণ্য - ঘেরা কনকদুর্গা মন্দির । পাশ দিয়ে এক মনে বয়ে চলেছে 'ডুলুং ' নদী ।

আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে বৈশাখ

মাসে তার হাঁটু জল থাকে --

মাসটা যদিও পৌষ, তবুও ডুলুং নদীতে হাঁটু জল কেন তার চে-য়েও কম জল ছিল । আমরা স্বচ্ছন্দ পার হয় গেলাম গরুর গাড়ি করেই । আমি এতই আনন্দে গদগদ হয়ে পড়ি যে লাফ দিয়ে

জলে নেমেই যাবো । তা ঐ বয়সে এরকম হয় বৈকি ! কনকদুর্গা খুবই জাগ্রত বলে জানা গেল । *দুটি মন্দির আছে । আদি মন্দিরটি বজ্রাঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত, বট-অশ্বত্থগাছ বেষ্টিত, ভেজা - ভেজা, শ্যাওলামাখা । মন্দিরটি বিষ্ণুপুর ঘরানার । নতুন মন্দিরটি লম্বা ধাঁচের, যার ভেতর রয়েছেন অশ্বারূঢ়া, অষ্টভুজা দুর্গাপ্রতিমা । মূর্তিটি অপূর্ব । অষ্টধাতুতে গড়া বহু প্রাচীন এই মূর্তি দুর্গা হলেও সিংহবাহিনী নন তাই যন আরো চমৎকার লা-গে ।*

আন্ডারলাইন করা এই অংশটি আমি পরে পড়েছি একটি জায়গায় ; এই বিস্তারিত বিবরণ ;কারণ তখন আমি এতই ছোট যে এগুলি মনে থাকার কথা নয় বা বোঝার বয়স নয় ।

নামটি কনকদুর্গা ---সার্থক নামকরণ । দুচোখ ভরে দেখলাম আমি সেই দেবীমূর্তি । লোকে মাতৃমূর্তি বলেন বটে কিন্তু আমার

কাছে উনি দেবীই । মাকে আদর করা যায়, গায়ে মাথায় হাত - বোলানো যায় কিন্তু এই সৌন্দর্য্য শুধু উপলব্ধি করার ।

মন্দিরের সামনে একটি একচালা কীর্তন মঞ্চ । একটু দূরে একটি চায়ের দোকান । আমরা ওখানে পাঁঠার মাংস ও ভাতের অর্ডার দিলাম । চাইলে ওরা রান্না করে দেন । দুপুরের খাওয়া ওখানেই সারা হল । তারপর বেলাভূমি ও শালবনের মধ্যে - ঘোরাফেরা । ডুলুং নদী তার নামের মতনই সুন্দর । একপাশে কয়েকটা খেজুরগাছ, অন্য পাশে ঘন বন । নি:সঙ্গ বালুচর ক- য়েকটি বক ও বলিহাঁস চোখ পড়লা । মন্দিরের একজন পু- রোহিত ছিলেন, তিনি জানালেন যে এই অঞ্চলের রাজারা ডাকাত ছিল । কনকদুর্গার অপরূপ মূর্তিটির সামনে, ডাকাতি করতে যাবার প্রাক্কালে রাজারা নরবলি দিতেন । মানুষের মাথাটি জঙ্গলে পুঁতে দেওয়া হত । দেহটি ভাসিয়ে দেওয়া হত ডুলুং এর জলে । কেমন গা ছমছম করে ওঠে । নির্জন ঐ - বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে তখন আমার ভীষণ ভয় করছিল । এ তো ছিন্নমস্তা নন,দুর্গা । দুর্গা তো ভয়ঙ্করী নন । কালী লোলজিহ্বা, ভয়াল । দশ মহা বিদ্যার অনেক রূপই তো ভয়াল । মূল শক্তি বা আদি শক্তি পার্বতী । তাঁর থেকেই সৃষ্ট সব নারী রূপ । কিন্তু পার্বতী তো শান্ত, সমাহিতা । তাই এরকম একটি অপূর্ব শৈল্পিক কীর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আমার কেমন যেন ‘ খারাপ লাগায়‘ মন ভরে গেছিল । সেই অনুভুতি আমার একান্তই আপন । কচি, স্পর্শকাতর মনে এইসব ঘটনা বড় ছাপ ফেলে । সুয্যিমামা বাসায় ফেরে। তার বিদায়চুম্বনে আকাশ লজ্জায় লাল ।

রোদের ওম, হিমে পরিণত হবার আগে আমরাও পরিষ্কার মন্দির প্রাঙ্গণ ছেড়ে আবার গাড়িতে চড়ে বসি । বাঁকা চাঁদ ওঠার আগে ফিরতে হবে আশ্রমে । আমার বর্তমান বাস যে শহরে, - সেখান শিউলি ফুটতে বড় একটা দেখিনি । ডিফেন্স কলোনীর দিকে তাও রাস্তায় কিছু ফুল পড়ে থাকতে দেখেছি ভ্রমণের সময় । আর মন মাতানো পুজার গন্ধ ভেসে আসেনা এখানে, - শোনা যায়না হৃদয় স্পর্শী ‘ঢ্যাংকুর কুর ’ বাজনা । তবুও যখন শরতের আকাশে ফালি ফালি পেঁজা তুলোর মতন মেঘ ভেসে যায় তখন বড্ড মনে পড়ে মাদুগ্গার কথা । এক অদৃশ্য রেলগাড়ি

চেপে চলে যাই বাংলার আঙিনায় । তারপর একসময় হঠাৎ শিউলিফুলটা ঝরে যায় মনের সবুজ গালিচায়, টুপ করে, ঠিক - যেরকম আপনমনে ফুটেছিল সেইভাবে । আমার পুজোয় বিসর্জনের বাজনা বেজে ওঠে ।

তুষার তীর্থ বিনসার

হিমালয় আমায় অসম্ভব টানে। জীবনে দেশে, বিদেশে বহু পাহাড় দেখবার সুযোগ ঘটেছে কিন্তু হিমালয় দর্শনের স্বাদই আলাদা । পাহাড় তো আদিমতার স্থান, ওখানে বেশি দিন থাকলে গায়ে শেকড় বেরিয়ে যায় । মনের সব জমাট বাঁধা কষ্ট নিমেষেই দূর হয়ে । আমরা ভ্রমণ প্রেমী । পায়ে আমাদের সর্ষে। এক জায়গায় বেশিদিন থাকা আমাদের ধাতে সয়না। ইচ্ছে করে সমস্ত বেড়াজাল ভেঙে ছুটে যাই তেপান্তরে, চষে বেড়াই সারা দুনিয়া । প্রায় সারা ভারতে ঘুরলেও উত্তর দিকটা আমার দেখা হয়নি । আমি দিল্লী পর্যন্ত গেছি । আমরা ক্লাব মহিন্দ্রার মেম্বার । লাইফ টাইম হলিডেয়িং করার জন্য। ওদের সারা ভারতে নানান জায়গায়

ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানান রিসর্ট আছে। বেশির ভাগই ফাইভ স্টার প্রপার্টি। উত্তর ভারতে অনেক জায়গায় আছে যার মধ্যে আমার মনে হল বিনসারেই যাওয়া যাক এই যাত্রা। পরে অন্যগুলো হবে এক এক করে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। বুকিং করা হল ৩ মাস আগে থেকে। যদিও আমরা Prefered member তবুও অনেক Prefered member একসঙ্গে এলে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ হয়ে দাঁড়ায় ফলে আমরা রিস্ক নিলাম না। কিন্তু পরে জানা গেল ঐ সময় বিনসারে অফ সিজন কাজেই বড় একটা কেউ যায়না । যাইহোক একদিন ভোরে দিল্লিগামী বিমানে করে এলাম সোজা ব্যাঙ্গালোর থেকে রাজধানী দিল্লি। দিন দিনমানে চলে গেলাম হোটেল । হোটেল আমরা ব্যাঙ্গালোর থেকেই বুক করে এসেছিলাম । সেখানে বেশির ভাগই বিদেশি পর্যটক। আমাদের পাসপোর্ট দেখতে চাইলো কারণ তা নাহলে উগ্রপন্থী ভাবার সম্ভবনা নাকি প্রবল । আমরা গুটি গুটি পাসপোর্ট বার করে দেখিয়ে দিলাম । রাতের বেলায় আমাদের যেতে হবে কাঠগোদাম পৌছানোর জন্য রাণীক্ষেত এক্সপ্রেস ধরতে ওল্ড দিল্লী স্টেশানে। সে এক কেলেঙ্কারী। রাত আন্দাজ সাড়ে নটা নাগাদ লটবহর নিয়ে বেরিয়ে এলাম রিসেপশানে । অত রাতেও বিদেশী পর্যটকদের ভীড়ে আমাদের দুজনের নাভি:শ্বাস উঠছে। কোনক্রমে বিল মিটিয়ে ওদেরই দেওয়া গাড়ি করে গেলাম ওল্ড দিল্লী স্টেশানে। সেখানে প্ল্যাটফর্ম খুঁজে দেখলাম তিল

ধারণের জায়গা নেই । অসংখ্য তীর্থ যাত্রীর ভীড় বিরক্তি ধরায় । যেহেতু বেশির ভাগই বিহারি কিংবা ইউ পির নিম্ন শ্রেনী তাই কোন বোধের বালাই নেই একজন তো ও-ও-ওয়াক করে আমার গায়ে বমন সেরে ফেলছিলেন আমি লম্ফ দিয়ে সরে যেতেই একটি সারমেয়কে প্রায় মাড়িয়ে দিচ্ছিলাম । ওটা কামড়ে দিলে কি আর এই যাত্রায় ঘোরা হত ? উহ্ ! ইট হ্যাপেন্স অনলি ইন ইন্ডিয়া ভেবে কপালের ঘাম মুছে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম । আর দাঁড়াবো কি ? জায়গা কোথায় ? গিজগিজ করছে মানুষ । হঠাৎ দূরে ঝিকি মিকি । রেল গাড়ি আসছে গো ! ওঠো ওঠো সবাই । পিল পিল করে লোকগুলো উঠে দাঁড়িয়ে ধস্তাধস্তি আরম্ভ করলো । সেকেন্ড এসির কূপ আসতেই যেই উঠতে যাবো ওমা ! আমাকে প্রায় ঠেলে রেল লাইনের তলায় ফেলে দিচ্ছিল ! মারা পড়ছিলাম আর কি ! ঈশ্বরের অশেষ কৃপায় রক্ষা পেলাম । উঠে বসলাম নিজের বগিতে । আমরা দুজন । আর এলেন অন্য যাত্রীরা যার ভেতরে এক ভদ্রলোক অবশ্য অভদ্র বলাই বোধকরি শ্রেয় কারণ তার পরের ঘটনা কোনরকমেই প্রমাণ করেনা যে ব্যাক্তিটি ভদ্রলোক তিনি অন্য একটি সীট দখল করে শুলেন । এই যাত্রা যেহেতু রাতে তাই সবাই ডাইরেক্ট শুয়ে পড়ছেন, উঠেই -কোন বসা নেই । বার্থগুলো নামানোই আছে । আমরাও শুয়ে পড়লাম এবং জীবনে যা হয়নি তাই হল, ট্রেনে সাউন্ড স্লিপ । প্রখ্যাত লেখকের লেখায় আছে না ? ট্রেনের চলমান অবস্থাকে উনি শব্দে ধরেছেন ! বরদারালু চিরিল নাইডু - রেলগাড়ি চলেছে । গুরুদারালু গুরুদারালু - ব্রীজ পেরোচ্ছে, মনে হয় এটা সৈয়দ মুস্তাফা আলীর লেখা ।

Nowadays my memory is playing tricks with me .....

উষাকালে ঘুম ভাঙলো ভদ্ররূপী লোকটির খ্যাঁক খ্যাঁকানিতে । মুখ থেকে লালা উদগিরণ করছেন আর প্রায় আমার দিকে বন্দুকের নল তাক করার মতন করে ছুঁড়ে দিচ্ছেন । আমি আলতো করে পাশ কাটাতেই সেই নিষ্ঠিবন ধাবিত হচ্ছে মাটির দিকে । সে এক কেলেঙ্কারী । সূর্যদেব উঠলেন । লালিমা ছড়িয়ে আকাশ হাসছে । ট্রেন ঢুকলো কাঠগোদমে । আমরা মার্চের কাবু করা শীতে মালপত্র নিয়ে নেমে স্টেশানে এলাম । জানা গেলো মহিন্দ্রা থেকে আমাদের জন্য গাড়ি পাঠিয়েছে । অত সকালে কোন দোকান

খোলেনি । তাই চা পর্ব বাদ রইলো । যদিও মনটা খুবই চা চা করছিল since I am a connoiseur of good tea. গত ১৩ বছরের মধ্যে বিনসারে এই বছর তুমুল বরফপাত হয়েছে । বিনসার- ২৪১২ meter চাঁদ রাজাদের গ্রীষ্ম কালীন রাজধানী ছিল (৭-৮ সেঞ্চুরি) । ঝন্ডিধর পাহাড়ে অবস্থিত বিনসার কুমায়ুন অঞ্চলের একটি সুন্দর শৈল শহর । মিষ্টি ফুলের সুবাস, পাইন, ওক, দেবদারু বনে ঘেরা এক স্বপ্ন পুরী । আর রডোডেনড্রন তো বিখ্যাত । লাল লাল থোকা থোকা ফুল সত্যি একটা দেখবার মতন জিনিস । কত অনাদরে পাহাড়ের ঢালে ফুটে আছে ।

প্রকৃতি ওদের রক্ষক । তবে ৩০০ কিমি বিস্তৃত হিমালয়ের নানান রেঞ্জ সবচেয়ে বড় আকর্ষণ । কেদারনাথ, চৌখামবা, ত্রিশূল, নন্দাদেবী, নন্দকোট, পঞ্চচুলি কয়েকটি তুষার মাখা পর্বত শৃঙ্গ । গাড়ি ছুটে চলেছে পাহাড়ি পথ দিয়ে । একদিকে বয়ে চলেছে একটি নদী । খরোস্রোতা । অন্যদিকে পাহাড়ি জঙ্গল । অচেনা গন্ধ, পাহাড়ের গন্ধ নাকে, চোখে, শিরায় শিরায় । উত্তেজনা জাগায় । মনে মাদকতা ছড়ায় । ভীষণ গা গুলাচ্ছিলো হয়ত হেয়ার পিন বেন্ডের আধিক্যে । অনেকক্ষণ ধরে চলার পরে এলাম মহীন্দ্রার রিসর্টে । সুবিশাল । সুন্দর । পাহাড়ের গায়ে গায়ে কটেজ, ডাইনিং হল, বাগান ইত্যাদি । আমাদের একটি ফুলবন ঘেরা কটেজ জুটলো । বেডরুম, বিরাট ড্রয়িং কাম লিভিং রুম, কিচেন, টয়লেট । একটি কার্ড দেখলাম টেবিলে রাখা, ওটাই লেখা আছে এই হিম হিম রাজ্যে, মেঘনীল দিনে কি করে সময় কাটানো যাবে । লিস্ট দিলাম । Horse riding, Trekking, Camping, Bird Watching, Rappelling, Painting, Party Games, Pahari Massage, Meditation, Recipe Contest, Clay Modelling, Vegetable Carving Class, Housie and Tambola, Arts and crafts, etc. আমরা অবশ্য এগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে শুধু রিল্যাক্স করলাম । দিনগত দৌড় ঝাঁপের থেকে অব্যাহতি পেতেই তো যাওয়া । রেস্ট টেস্ট নিয়ে পরের দিন যাবো জাগেশ্বর । দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম এটি । দেবদারু আর পাইন ঘেরা পাহাড়ি বনে পাথরের ছোট বড় মন্দির । ৬৫ কিমি দূরে, ১৮৭০ মিটার উঁচুতে । পাহাড়ের কোলে গম্ভীর পাহাড় ও দেবদারু, পাইনে ঘেরা অপরূপ পাথরের কারুকার্য করা এই মন্দিরটি প্রাচীন কালের এক

শিব মন্দির। একই চত্বরে ১২৪ টি মন্দির আছে। দেখবার মতনই বটে। যখন গেলাম তখন প্রতিটিতেই শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হল। নানান আকৃতির। নানান বর্ণের। তিনটি বিশেষ মন্দির জগেশ্বর, পুষ্টিদেবী ও মৃত্যুঞ্জয় কে উৎসর্গ করা। শিবরাত্রির সময় এই উপত্যকায় বিশাল মেলা হয় বলে জানা গেল। শিব শক্তির উপাসনায় মানুষ দূর দুরান্ত থেকে ছুটে আসেন এই পবিত্র পাহাড়ের ঘন বনে ছাওয়া উপত্যকায়। মন্দিরের বাইরেও উন্মুক্ত স্থানে একটি লিঙ্গ দেখলাম। অঝোর ধারায় বয়ে চলেছে একটি ঝোরা মন্দিরের ঠিক পেছনে। খুব মনোরম পরিবেশ। ঠান্ডা হাওয়া, ধুপের সুগন্ধ সব মিলিয়ে মনটাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় এক অচিন দেবলোকে। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হিমালয়ের পথে পথে যেন সমস্তটা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করলাম। বাইরে একটি মিউজিয়াম আছে। সেখানে এই মন্দিরের সৃষ্টি কাল থেকে শুরু করে আজ অবধি নানান দুর্গার মূর্তি রাখা আছে। কেউ অশ্বরূঢ়া, কেউ করাল বদনী, কেউ কৃষ্ণা প্রতিমা কেউ বা সিন্ধু সভ্যতার মতন কোন অবয়ব। অসাধারণ সব কারুকার্য, ভাস্কর্য। জীবনে খুব বেশি ভাস্কর দেখিনি যাঁদের শিল্প বোধ অসাধারণ। তারই মাঝে এই দুনিয়ার আনাচে কানাচে যখন কোন অসাধারণ শৈল্পিক কীর্তি চোখে পড়ে মনটা জুড়িয়ে যায়। আমার শিল্পী সত্তা নিবিষ্ট চিত্তে পর্যবেক্ষণ করে চলে এই সৃষ্টির বিস্তারগুলো। ছবি তোলা বারণ তাই তোলা গেলো না। বাইরে একটি দোকানে চা খেলাম। এক পান্ডা ধরলো পুজোর জন্য। কিইবা করবে ওটাই ওর রুটিরুজি। আমরা পুজো দেওয়াতে উৎসাহি ছিলাম না। আমাদের দেবতার বসবাস যদিও মানুষের মধ্যেই তবুও ওকে এই ব্যাপারে কোন সাহায্য করলাম না। ফিরে এলাম।

আসার পথে লাখুদিয়ার গুহা দেখলাম। লাখুদিয়ার মানে এক লক্ষ গুহা। যদিও এখানে কোন গুহা নেই আছে খাড়া পাহাড় ও কিছু প্রাগৈতিহাসিক গুহালিপি ও চিত্র। অনেকটা স্বস্তিকা চিহ্নের মতন। লাল দিয়ে আঁকা। কয়েকটা গাঢ় বাদামী। খুব খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে হয় পাহাড়ের ওপর। খুব একটা উঁচু নয় অবশ্য। তবে পাশেই গভীর খাদ ও সিঁড়িগুলো পিচ্ছিল। লোহার রড দেওয়া হলেও খাদের দিকে তাকালে ভয় লাগে। রোমাঞ্চ হওয়াটাও স্বাভাবিক। সন্তর্পণে হেঁটে গেলাম ওপরে। দেখে এলাম গুহালিপি। বড় একা বড় নি:সঙ্গতায় ভরা।

আশ্চর্য জনকভাবে হাজার হাজার বছর এই শিলালিপি গুলো রয়েছে । স্টোন এজের এই চিত্র গুলো আলতামিরার বাইসনের মতনই বয়সের ভারে জীর্ণ । আর দেখবার আছে চিত্তাই দেবীর মন্দির । আমরা আর গেলাম না । অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল । সোনার কেল্লার মতন এরা যেখানেই পেরেছে একটা করে মন্দির গুঁজে রেখেছে । সকালের সামান্য প্রাতরাশ পাহাড়ি পথে ওঠা নামা করতে করতে কতক্ষনই বা পেটে থাকে ? তাই একটা ছোট হোটেলে গিয়ে বসলাম ।কারণ রিসর্টে পৌছাতে পৌছাতে বিকেল হয়ে যাবার সম্ভবনা । সাধারণ খানা কিন্তু ক্ষিদে পেটে অমৃত সমান । ভাত (চাল গুলো পাশবালিশের মতন) ডালের জল, অচেনা সবজি আর মোটা একটা জাজিমের মতন ওমলেট । সঙ্গে প্রচুর স্যালাড । দিব্যি খেয়ে আবার রওনা দিলাম । সময় মতন রিসর্টে গিয়ে গরম জলে ভালো করে স্নান করলাম । ততক্ষণে ঐ পাশবালিশ হজম হয়ে গেছে । আবার খাবারের অর্ডার দিলাম । খেতে আর ঘুমতেই তো আসা ! কিচেনে ঢুকে কফি বানিয়ে ডুব দিলাম একটা জন গ্রিশামে । এর চেয়ে প্রিয় কাজ আমার আর দুটি নেই গো কন্যে ! তারপর খাবার এলো ।অসাধারণ সব স্ন্যাক্স । খেলাম । গান করলাম । পতিদেব রেকর্ড করে নিলেন । পুরনো কিছু রেকর্ডেড ছিল সেগুলো শুনলাম । নিজের গলা বলে চিনতেই পারছি না । একদম অন্য রকম শোনাচ্ছে । বেশ খুশি হলাম । বহু মুখী প্রতিভা মনে করে নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে দিলাম । কিন্তু এমন পোড়া দেশে জন্মেছি যে প্রতিভা থাকলেও কিছু হবার যো নেই মনে করে একটু দু:খও হল । আমাদের রিসর্টটির ওপরেই বেশ কিছু দূরে আছে বিনসার ফরেস্ট । চিতা, বার্কিং ডিয়ার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হিমালয়ান বিয়ারও দেখা যায় । রডোডেনড্রন ও ওক গাছের জঙ্গলে জেগে ওঠা এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা । এখানে আছে হিমালয়ের ভেষজের অনন্য ভান্ডার । প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র যেমন চরক, শুশ্রুত সংহিতায় হয়ত সেইসব ভেষজের নাম আছে । প্রসঙ্গত মনে পড়ে একবার বেড়াতে গিয়ে দক্ষিণের কোন অঞ্চলে এক আমেরিকান ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হয় । উনি রিসার্চ করেন । বললেন – তোমাদের ভারতে এত সমৃদ্ধ ভেষজ ভান্ডার আছে তোমার কেন কেমিক্যালসের দাশ হও ? কে আর বোঝায় ওঁকে যে আমরা নকল নবীশ । নিজেদের সব বিলিয়ে দিয়ে আমরা অন্যের কৃত্রিম জিনিস লুন্ঠন করে আনতে একটুও কুন্ঠা বোধ করিনা । সেটাকেই বাহাদুরি মনে করি । ব্যাক্তিগত জীবনে এক সাধুকে

চিনি যিনি মাঝে মাঝে না খেয়ে শুধু একটা শেকড় খেয়ে বেঁচে আছেন। এতে নাকি শরীরের মেদ বর্দ্ধনও কমে যায়।

নামটা জানিনা। জানলেও আমার পক্ষে হিমালয়ে গিয়ে তো এটা আনা সম্ভব নয় কাজেই উৎসাহ দেখাই নি। ২০ কিমি দূরে আছে কসর দেবীর মন্দির। এখানে স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যান করতে যেতেন।পাহাড়ের কোলে অপরূপ এক স্থান।

কুয়াশা মাখা রিসর্টে ফিরে সেদিনের মতন তো বিশ্রাম নিলাম। রুম হিটার চালানো হয়েছে, অসম্ভব শীত। পরদিন ভোরে যাবো পাতাল ভুবনেশবর। তীর্থক্ষেত্র। কথায় বলে গঙ্গোত্রি, যমুনেত্রি, কেদার ও বদ্রী এই চারধাম যাত্রার সমান এই পাতাল ভুবনেশ্বরে যাওয়া। ১২০ কিমি দূরে। পাহাড় ছেড়ে সমতল, ভ্যালি। হলুদ হলুদ হরিয়ালি ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ধুলিমাখা মেঠোপথ দিয়ে পৌছলাম মন্দির এর কাছে। ওটা পাহাড়ের গায়ে। কিছুটা রাস্তা নেমে যেতে হয় খাড়া সিঁড়ি বেয়ে আর স্লিপের মতন একটা ঢাল বেয়েও যাওয়া যায় তবে সেটা একটু পিচ্ছিল। ধীরে ধীরে গেলাম মন্দির মুখে। সেটা একটু উঁচুতে। রাস্তায় কিছু বঙ্গ ললনাদের দেখলাম ভক্তিভরে যাচ্ছে মন্দির দর্শনে। আর অজস্র বিহারি। মেটে সিঁদুর পরা ডানদিকে আঁচল দেওয়া শাড়িতে। মন্দিরটা ভু গর্ভস্থ। পাহাড়ের গায়ে একটি গুহার মতন খুব ছোট মুখটা। আর নীচে নেমে গেছে অজস্র পেছল সিঁড়ি। দু দিকে চেন দেওয়া রয়েছে ধরে নামতে হবে। ভেতরে আছে প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট বিভিন্ন পাথরের মূর্তি ও কারুকার্য, কিছুটা stalactites, stalagmites ধরণের। এখানে সবই ন্যাচেরাল ফর্মেশন অফ রকস্।

ত্রেতা যুগে প্রথম আসেন অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণ। স্বয়ং বেদব্যাস সেই কথা বলেছেন। স্কন্দপুরাণে। পরে আদি শঙ্করাচার্য যিনি খুব বড় স্কলার ছিলেন তিনি এই গুহায় এসেছিলেন। তিনিই এখানে একটি লিঙ্গমকে পুজো করার রীতি চালু করেন। সেই পুজোই আজ যুগ যুগ ধরে হয়ে আসছে।পিথরাগড় থেকে ৯১ কিমি দূরে কালী নদীর ধার দিয়ে চলতে চলতে (এই নদী ভারত ও নেপালের সীমানায় অবস্থিত) আসবে ছোট্ট পাহাড়ি গঞ্জ। সেখানেই এই গুহা বা তীর্থক্ষেত্র। পুজারি শ্রেণিই এর আশেপাশে বেশি

বসবাস করে। অরণ্য আছে দূরে। পাল পাল হরিণ দেখা যায় মাঝে মাঝে। এই গুহার অনেক অংশে আজও মানুষ পদার্পণ করতে সক্ষম হয়নি। দেবনাগরি লিপিতে কিছু লেখা দেখা যায় গুহার দেওয়ালে। চাঁদ ও কাত্যুরি বংশের রাজাগণ এই মন্দির সংস্কার করেন তবে প্রাচীন ঐতিহ্যকে বজায় রেখে। ভেতরে অজস্র দেবদেবীর মূর্তি। কোথাও অনন্ত নাগের গড়ন কোথাও শিব কোথাও বা চন্ডিকা ইত্যাদি। একটি জায়গায় শিলাখন্ড আছে, মোট চারখানা। তার মধ্যে ৩টি ছাদ ছুঁয়েছে। কারণ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর পেরিয়ে গেছে। ওগুলো ঐ সব যুগের মাইলস্টোন। কলিরটা নাকি এখনো শিশু। অর্থাৎ এই দুনিয়ায় আমরা যা অরাজকতা ভোগ করছি বা দেখছি তার এখনো শৈশব স্টেজ। এইভাবে ভাবা যায়। *সবে তো কলির সন্ধ্যে* কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়, ওটা দেখলে মনে হবে কলি সবে জন্মালো। কালভৈরবের সারমেয়র জিহ্বা, শেষনাগের ছত্র, শিবের জটা এইসব রক ফর্মেশন আছে ভেতরে। তবে ভেতর থেকে এসে একজন বলছিলেন, ওভারহিয়ার করলাম যে ভেতরটা খুব দমবন্ধ হয়ে আসা গোছের। হাঁপানি রোগিদের সমস্যা হতে পারে। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় বসে নামতে হয়। খুব কষ্টসাধ্য। আরও কষ্টসাধ্য বোধহয় ওঠা। কারণ ছাদ অসম্ভব নীচু কাজেই উবু হয়ে ঝুঁকে উঠতে হবে ঐ পিছল সিঁড়ি দিয়ে। এইসব দেখে আমি আর ভেতরে যাইনি। শুনলাম আগে নাকি ঢালু রাস্তা ছিল পরে সিঁড়ি করে দিয়েছে। তাতে সুবিধে হয়েছে কিনা বোঝা গেলনা। আমার পতিদেব গেলেন। দেখে এলেন। হিন্দু মাইথোলজির চূড়ান্ত নিদর্শন। পাথরের আকৃতি গুলো ঠিক যেন বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, বিস্ময়কর বৈকি ! ব্রহ্মার অভিশাপ প্রাপ্ত হংস, দেবী ভুবনেশ্বরী তাঁর অস্ত্র শস্ত্র সমেত- নিঁখুত গড়ন মুখ ও অন্যান্য অংশের, গণেশ সহস্রদল কোমল সহ, কামধেনুর স্তন থেকে সফেদ দুধের শিলাবিন্দু পড়ছে ব্রহ্ম কপালিতে, স্বর্গীয় গাছ কল্পবৃক্ষ -ডিটেল আকৃতি, ইন্দ্রর ঐরাবৎ ও তার হাজার পা, সপ্তর্ষিমন্ডল ইত্যাদি। কি নেই ? এই গুহা ৬০০০ বছরের পুরনো, ৬৫টি মন্দির আছে গর্ভগৃহে। বেদব্যাস বলেছেন এই গুহা পৃথিবীর সমান পুরনো এবং এর শুরু ও শেষ কোথায় কেউ জানেনা। চারটি দরজা আছে। বলা ভালো ছিল। রণ দ্বার, পাপদ্বার, ধর্মদ্বার ও মোক্ষদ্বার। পাপ দ্বার ও রণদ্বার বন্ধ হয়ে গেছে। অন্য দুটি খোলা আছে। কথিত আছে পাপ দ্বার রাবনের বিনাশের পরেই বন্ধ

হয়ে যায় আর রণ দ্বার বন্ধ হয় মহাভারতের যুদ্ধের পরে । শুনেছি ভেতরটা সম্পর্কে লোকে বলেন যে ওটি ---:: Tranquil, thoughtful, deep and detached ....all pointing to sacred intelligence of nature.

আমার দেখা হলনা । মনে দু:খ নিয়ে ফিরে চললাম । আশেপাশের জঙ্গল, শীতল হাওয়া, বুনোফুল বেশ মাদকতা জাগায় । আর আমাকে আসতে দেখেই কিছু ফুল টুপ করে ঝরে পড়লো ঘাসের ওপর । একটি পাখি গান জুড়ে দিল ।

বললাম- কি হে খেয়াল গাইছো না তো ?

ও হেসে বললো- না গো মানবী আমি ভজন গাইছি, পাতাল ভুবনেশ্বরে কেউ খেয়াল গায় নাকি ? তুমি তো খুব বোকা ! বলেই ফুরুৎ করে ল্যাজ গুটিয়ে উড়ে গেল । পায়োজি ম্যায়নে রাম রতন ধন পায়ো -- সুমিষ্ট গলায় চমকে উঠি ! তা হলে কি পাখিটা ! ওমা কোথায় পাখি ? এক অপরূপা । আহা কি দেখতে । গলা টাও ভারি মিষ্টি । জানা গেল এই চত্বরে ওরা গান গেয়ে ভিক্ষে করে । এরকম গ্ল্যামারাস ভিখারিনীর করপল্লবে আমিই পয়সা থুড়ি টাকা গুঁজে দিলাম । পতিকে আড়াল করে নিলাম । আসার সময় জঙ্গল পেরিয়ে এসেছিলাম । আমাদের গাড়ির ড্রাইভার বলেছিল যে এই বনে চিতা দেখা যায় । ও প্রায়ই দেখে । সাঁঝবেলায় চিতা ওকে হ্যাল্লো করে যায় । কপাল ভালো হলে আজই দেখা পাবো আমরাও । আমি ব্যাঙ্গালোরে থাকলেও জঙ্গলের কাছেই থাকি । বাড়ির অল্প কি-মির ভেতর জংলী হাতি আসে, আসে চিতা । ফার্ম হাউস থেকে ধরে নিয়ে যায় তার প্রিয় খাদ্য কুকুর । তবে আমাদের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে এতই সিকিউরিটির হ্যাপা যে জঙ্গল থেকে এসেও আমার গৃহ অবধি পৌছানো যাবে না ! মানুষই পারবে না তো চিতা তো কোন ছাড় ! এতদুসত্ত্বেও পাহাড়ি চিতা অন্য জিনিস ।

যথারিতি ফেরার সময় গাড়িতে গান চলছে ।

ভিগি ভিগি রাত মে ফির তুম আয়ো না, এইসি বরসাতও মে আয়ো না --

ঝিরি ঝিরি অসময়ের বৃষ্টি, চারপাশে বাতাসের সফেদ চাদর, এক জায়গায় হঠাৎ আমাদের গাড়ির সারথী নীতিনের চিৎকার --- চিতা-আ-আ।

ঐ যে লেপার্ড !সত্যি এসেছেন তাহলে --

চিতাবাবু যে বলিউড প্রেমী বেশ মালুম হল। হিন্দিও বোঝেন নিশ্চয়। চুপটি করে বসে রইলেন আর জ্বল জ্বল করে তাকিয়ে রইলেন আমাদের দিকে। আসলে নীতিন বলছিল যে ও প্রায়ই চিতাকে দেখে তবে অনেকদিন দেখেনি আর চিতাও ওর গৃহিনীকে বলছিল যে আজকাল নীতিনকে দেখাই যায়না তো ! কাজেই শুভ সন্ধ্যালগনে চার চোখের মিলন হয়ে গেলো। অদ্ভুত ওর চোখ দুটি। সে খুব স্মার্ট ও ডেবোনেয়ার। চিতার সঙ্গে রোমান্টিক চোখাচোখি সেরে এলাম সেই ঘন বনের প্রান্তরে। বিক্ষিপ্ত বন তখন অভিমানী সাঁঝের পরশে, কালো বরণ থেকে চুইয়ে পড়ছে বিন্দু বিন্দু শিশির। কুয়াশা মোড়া বনানী নীরবে লিখে চলে মানব ও চিতার সখ্যতার জান্তব কাহিনী। আমরা ছবি তোলার কথা ভেবেছিলাম কিন্তু পরে মত বদল করে ফিরে যাই রিসর্টে। কারণ চিতা যদি আমাদের ওপর বিরক্ত হয়, ওর থাবার স্পর্শে অবস্থা হবে শোচনীয়। অতএব সোজা মহিন্দ্রার রিসর্টে। যেখানে অপেক্ষা করেছিল সুন্দর রেন ড্যান্স ও ক্যান্ডেল লাইট ডিনারের উৎসব।

এরপর দিন সকালে গেলাম গণনাথে। এটিও শিব মন্দির। পুরাতন ও অচর্চিত।

২৫ কিলোমিটার দূরে ২১১৬ মিটার উচ্চতায় গণনাথের মন্দির। এই স্থান মন্দির ও গুহার জন্য বিখ্যাত।

রিসর্ট থেকে যাত্রাপথ খুবই মনোরম। পাইন, ওক ও রডোডেনড্রন বন পেরিয়ে এক অসামান্য মন্দির যা দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। প্রাকৃতিক শোভা ও মন্দিরের পুরাতন গঠণশৈলি সব মিলিয়ে মন তৃপ্ত হয়। ৫৫০০ ফিট উচ্চতায় আছে জলনা। এখান থেকে হিমালয়ের দিগন্ত বিস্তৃত রূপ

দেখা যায়, apricots, peaches, pears, plums -apples এই সমস্ত ক্ষেত এখানে রয়েছে ।

আমরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে অমসৃণ পাহাড়ি রাস্তায় চলার পরে এলো গণনাথের মন্দির।

গাড়ি একটু উঁচুতে দাঁড় করিয়ে যেতে হল মন্দিরে । সেটি অনেক নীচে । বেশ খাঁড়া সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয় । কোন যুগের সিঁড়ি কে জানে ! নামতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল আমার । নীচে অবশ্য খুব সুন্দর মন্দির ও পাহাড়ের রূপ দেখে নিমেষেই কষ্ট উধাও । যাবার পথে অনেকগুলো তুষার মোড়া চূড়া দেখা গেলো । বিরাট রেঞ্জ । সুর্যের আলো পড়ে ঝিকমিক করছে । আর সাদা সাদা ঝকঝকে শৃঙ্গগুলো দেখে মনে হয় এক্ষুণি গিয়ে ছুঁয়ে দেখি !নন্দাদেবী, ত্রিশুল, বাঁকাটিয়া, পাংখাচুলি, মাকটোলি, নন্দাঘাট, নন্দাখোট ইত্যাদি । বরফে মোড়া পাহাড় ডাকে হাতছানি দিয়ে, ডাকে পাইন ওক বন, হিমেল হাওয়া কানে কানে গেয়ে যায় মিঠে গান । ফিরতে কি ইচ্ছে করে ?তবুও তো ঘন্টা বাজবেই একসময় । ভেবে মন খারাপ হয়ে যায় । হঠাৎ চোখ পড়ে একটু দূরে রডোডেন্ড্রন বনের দিকে । লালিমা মন মাতায় । সবুজের কোলে লাল লাল থোকা থোকা ফুল । অপূর্ব । নেমে একটা ছবি তোলা হল । বেশ কিছুটা নিচে, পাহাড়ের ঢালে বলে খুব পরিষ্কার এলোনা ছবিটি যদিও । হিমালয় রডোডেন্ড্রনের দেশ । নানান রঙের এই ফুল এই পর্বতমালার শোভা অনেককাংশে বৃদ্ধি করে নি:সন্দেহে । পাতাঝরা গাছের পাতার মচমচানি আর হালকা শিশিরের শিরশিরানি পেরিয়ে এক অসামান্য সবুজ রাজ্য । গাছে গাছে রং বেরংএর পাখি দেখা যায় । নাম জানি না, জানার প্রয়োজনও নেই । কি হবে ? এসেছি মাধুর্য্য উপভোগ করতে । আম খেয়ে চলে যাবো, বাগিচার খবর নিয়ে কাজ কি ! নীচে গেলে দেখা যায় একটি পাহাড়ি ঝোরা অনবরত ঝরে পড়ছে পাথরের বাবা গণনাথের মাথায় । মূর্তিটিও অসাধারণ । জানি না কে কিংবা কারা এটা তৈরি করেছেন তবে যিনিই করুন তাঁর শিল্প বোধ যে অতুলনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না । কষ্টি পাথরের মূর্তি মনে হল । তারই মধ্যে সুক্ষ্ম করুকার্য । আমাদের চেনা শিব ইনি নন । শিবত্বে অবাঙ্গালী ছোঁয়া । মুগ্ধ

দৃষ্টিতে চেয়ে আছি । কুলকুল করে বয়ে চলেছে ঝোরা । জলের ছিটে এসে লাগছে সারা দেহে । ভিজে যাচ্ছি আমি । সিক্ত স্যালোয়ার কামিজে এগিয়ে গেলাম বাবার মাথায় জল দিতে । পরিষ্কার ঘড়া রয়েছে অনেকগুলি । যেকোন একটি নিয়ে মাথায় জল ঢালো ।জীবনে কোনদিন শিবের মাথায় জল ঢালিনি । গণনাথ বাবাকে বললাম–

সবার মঙ্গল করো । অমিত্রদের শুভবুদ্ধি প্রদান করো । পুরোহিত এলেন আমাকে জল দিতে দেখে । আমাকে কোনভাবে সাহায্য করবেন কিনা জিজ্ঞসা করলেন । আমি মৃদু স্বরে আমার বক্তব্য জানিয়ে বাইরে চলে এলাম । একটি চায়ের দোকান আছে । আর কিছুই নেই । পাহাড়ের খাঁজে এই মন্দির ও দোকান । সেখানে গরম চা খেলাম । ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল । কাজেই চা বেশ উপাদেয় মনে হল ।

আরো নীচে নেমে গেলে আছে মল্লিকা দেবীর মন্দির । মল্লিকা দেবী নেপালী দেবী বলে জানা গেলো । কিন্তু সেটি ৪ কিলোমিটার ট্রেক করে যেতে হবে যা আমার পক্ষে নেহাতই অসম্ভব । লোকেরা যাচ্ছেন । বিশেষ করে অল্প বয়সী ছেলেপুলেরা । ঐ জায়গা থেকে নাকি অসাধারণ সমস্ত দৃশ্য দেখা যায় । পাহাড়, ফুল, শ্যামলিমা, ঘন বন ইত্যাদি । মন হয় পাগলপারা । বাউল, উদাস ।মল্লিকা দেবীর মন্দিরে যাওয়া হলনা বলে আমার একটু দু:খ হচ্ছিল । কি আর করা । বয়সের ভারে আমি ন্যুব্জ । তবে ফেরং আসার সময় যা সৌন্দর্য্য চোখে পড়লো তাতে দু:খ অনেকাংশেই কমে গেলো ।সেই রূপ তো লিখে বর্ণনা করা যায়না । দেখতে হয় । দেখলাম একটি অদ্ভুত ফুল । জানা গেল সেটি ব্রহ্মকমল । সেটি দেখা খুবই সৌভাগ্যের কথা । জানিনা সত্যি ঐ ফুল ছিল কিনা । মন মাতলো Almora Magnesite Mines -- খনি দেখে । পরিত্যক্ত খনি এগুলো । দুর থেকে মনে হয় রূপার খনি । চকচক করছে । সবুজের সঙ্গে মিলে রয়েছে বলে বেশ একটা অন্য রকম শোভা । রিসর্টে ফিরে ভালো করে গরম জলে স্নান করে খুব খেলাম । গান করলাম । আড্ডা হল ।

তারপর ফেরার তোড়জোর শুরু হল । সব গুছিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম । পরদিন ওরা একটি ফর্ম ভরতে দিল কেমন লাগলো এই হলিডেয়িং

ইত্যাদি নিয়ে । ভরলাম । আলাপ হল এক কুমায়নি কবির সঙ্গে । স্থানীয় ভাষা কুমায়নিতে উনি লেখেন । মাইথোলজি, নেচার, প্রেম এইসবই ওনার বিষয় বস্তু । জানলাম যে রবীন্দ্রনাথ থেকে গান্ধীজি এই কুমায়ুনে সময় কাটিয়েছেন । আর বীরপুরুষ জিম করবেট তো এখানেই ছিলেন ।

রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির কবিতা লিখেছেন এখানে বসেই । সকালের সোনারোদে রিসর্টের দুয়ারে বিকিকিনি সারতে এসেছে কানে ঝুমকো পরা মাথায় ফুল গোঁজা পাহাড়ি মেয়েরা । কমলালেবুর ঝুড়ি নিয়ে । হয়ত বা গেয়ে উঠছে : ঝুড়ি কি নিচে কেয়া হ্যায় ! বাতাসে বনজ কদম আর অপার্থিব জুঁই ফুলের সুবাস । প্রাণ ভরে শুঁকে নিলাম । কাঠগোদাম ফেরার সময় গাড়িতে গান চালানো নিষেধ । সরকারি ফরমান জারি হয়েছে । এতে দূর্ঘটনা বাড়ার সম্ভাবনা বেশি । আমি বেশ হতাশ হলাম । দেখলাম আমাদের সারথীও হতাশ । ওর দু:খ গান না চালাতে পারার, হয়ত ওর ডি জে হবার বাসনা ছিল । কারণ যেরকম ভাবে ও ক্ষেপে উঠলো এই নিষেধাজ্ঞা নিয়ে তাতেই মালুম হল যে ও হয়ত ভেবেছিল ডি জে সুকেতুর মতন ওরও রিমিক্স একদিন ঘরে ঘরে চলবে ---

লায়্লা ও লায়্লা, এয়সি হু লায়্লা, হর কোয়ি চাহে মুঝসে মিলনা একেলা --

প্রথমে নাহলেও পথের শেষে গানহীন হয়ে যেতে যেতে বেশ কষ্টই হচ্ছিল । বোরিং । আমি গানপাগল বলেও হতে পারে । মাঝে রাস্তায় চেকিং হল, পুলিশ চেকিং । সত্যি কোন ক্যাসেট বা সি ডি প্লেয়ার লুকানো আছে কিনা । যখন দেখলো সেরকম কিছু নেই আমরা ছাড়া পেলাম । ছোট্ট কাঠগোদাম স্টেশান এখনো চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই । ভেবেছিলাম একধারে হয়ত ভিজে বা চেরা কাঠ স্তূপ করে রাখা থাকবে, কাঠের গুদাম কিন্তু সেরকম কিছুই দেখা গেলো না । ছোটবেলায় উদয় শঙ্করের একটি জীবন কাহিনী পড়তে পড়তে যখন জানলাম যে ওঁনারা কাঠগোদাম হয়ে আলমোড়া যেতেন তখন মনে মনে একটা ছবি এঁকে নিয়েছিলাম । কিন্তু সে ছবি মেলেনি । কিছু ভিখারি দেখেছি আলমোরা চত্বরে গান করে ভিক্ষা করে তারা আগে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে গান করতেন । সেরকম

এক ভিক্ষুককে দেখলাম অবশ্য গান নয় পান খাচ্ছেন। আমাদের দেখেই চিনতে পেরে স্মাইল দিল। অনেকটা বৈষ্ণব স্টাইলের ভিখারি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেই এসে গেলো ট্রেন। আমরা মাল নিয়ে উঠে পড়লাম। ভোরে পৌছাবো দিল্লী। রাতে কিছু খাবার জুটবে বলে মনে হলনা। যদিও পতিদেব ক্যান্টিন থেকে এনে দিলেন পাউরুটি ও ওমলেট। রেলের ক্যান্টিন হলেও বেশ ঝকঝকে। লালুজির কৃপা। তাই খেয়ে নিদ্রা দেবীর কোলে ঢলে পড়লাম। সকাল হবার অনেক আগে দিল্লি শহরে ঢুকে ভিখারি ও কুকুরের সহাবস্থান দেখতে দেখতে আবার ডুব দিলাম দিন গত পাপক্ষয়ে। পূর্বাকাশে ময়ূখমালী হেসে উঠতেই জেগে উঠলো তুষার তীর্থ বিনসারের স্মৃতি। হ্যাঁ স্মৃতি তো ! বিনসার ছেড়ে এসেছি অনেকক্ষণ হল। দূরে প্রকট হচ্ছে দিল্লি বিমান বন্দর। ব্যাঙ্গালোরের বিমান হাতছানি দিয়ে ডাকছে - আয় আয় !! পাশে বসে ক্যামেরা বন্দী হিমালয় তির্যক দৃষ্টিতে ব্যাঙ্গ করে বলছ- কি নগর কন্যা পারলে ওখানে থেকে যেতে ? পাহাড় না ডাকলে ওখানে থাকা যায়না। সমুদ্রের মতনই সেও অযাচিত বস্তু ফিরিয়েই দেয়।

পশ্চিমের পুব

পশ্চিমের পুব নয় -পুভার । শ্যামল, সুন্দর রাজ্য কেরালার ব্যাক ওয়াটারে অবস্থিত একটি বিলাস বহুল রিসর্ট আমাদের এবারের গন্তব্যস্থল । আমরা খুব বেড়াই । পায়ে চাকা, পিঠে ডানা । সময় পেলেই বেড়িয়ে পড়ি কোথাও না কোথাও । পাহাড়, অরণ্য, সাগরপাড় কিছুই বাদ যায়নি । মরুভূমিও হয়ে গেছে । কাজেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করি এগুলো । কিন্তু ব্যাক ওয়াটার দেখা হয়নি । তাই বিমানের টিকিট কেটে একদিন চড়ে বসলাম কেরালার পুভারের উদ্দেশ্যে । সঙ্গে বৃদ্ধা মা ও পতিদেব । ব্যাঙ্গালোর থেকে ভোরবেলা যাত্রা শুরু করে ত্রিবেন্দ্রাম বিমান ঘাঁটি । সেখান থেকে রিসর্টের ভাড়া করা গাড়িতে করে অনেকটা দূরে যেতে হল । ডাঙায় গাড়ি থেমে গেলো । বললো : নেমে যান, নিচে নদী । নদীর ওপরে আছে নৌকা । নিয়ে যাবে রিসর্টে ।

আমরা ভালো মানুষের মতন নেমে গেলাম । নদী ঠিক নয় ব্যাক ওয়াটার । সমুদ্র থেকে জল ঢুকে পড়েছে বিভিন্ন খাল জাতীয় জায়গা দিয়ে । স্রোতের টান মন্দ নয় । দুপাশে নারকেল গাছের সবুজ সারি । দৃষ্টি নন্দন । গাছগুলো ঝুঁকে পড়েছে জলের ওপর । যেন দুই সখী কথা বলছে, একে অপরের সঙ্গে । জলের রঙ কোথাও সবজে কোথায় ঘোলাটে । বৈঠার ছলাৎ ছলাৎ শব্দে, তরঙ্গ ভেঙে খান খান হয়ে সাদা রং ধারণ করছে । ভালো করে দেখলে মাছ দেখা যায় । ঝাঁক বেঁধে চলেছে । আমাদের সঙ্গে একই নৌকায় রয়েছেন এক গোয়ানিজ দম্পতি । সুটকেশের পরিচ্ছন্নতা দেখে বোঝা যায় মধু চন্দ্রিমায় চলেছেন । ঢলাঢলিও হচ্ছে । যা এই বয়সে হয় । অবান্তর কথা ও গাল গল্প । যার হয়ত তেমন প্রয়োজন নেই আবার আছেও । মানবিক সংলাপ, ভাষার বিচ্ছুরণ, এলোপাথারি তাল ও লয়ের মূর্চ্ছনা । নিজের হানিমুনের কথা মনে পড়ে । তিন তিনবার হানিমুনে গেছি । পর পর । সমুদ্র, পাহাড় ও জঙ্গলে।

গার্গীর নাম পাল্টে উদ্ভট্টাচার্য করে দেওয়া যেতে পারে ! কী বলেন ?

জলে ভাসমান কতগুলি কটেজ । কাঠের মনে হয় । প্রতিটির সামনে একটু বারান্দা । বারান্দায় বসলে দেখা যায় সমুদ্রের উত্তাল ফেনারাশি । একটু দূরে প্রাইভেট বিচ । সৈকতে যেতে হলে পায়ে হেঁটে আমাদের ছোট নদী পেরোতে হবে । এই নদীই হল ব্যাকওয়াটার । বাংলায় কী বলে আমার জানা নেই । পিছুটান নাম দেওয়া যায় কি? আমাদের অবস্থান এই কটেজে নয় জেনে মন:ক্ষুণ্ন হলাম কিন্তু পরে মনে হল ভালই হয়েছে । গভীর রাতে সাপ খোপ ঢুকে যেতে পারে ।

সুখনিদ্রায় সর্পাঘাত বাঞ্ছনীয় নয় কোনমতেই ।

আমাদের অবস্থান জমিতে । বলা ভালো জঙ্গলে । পাড়েই জঙ্গল । সেখানে অনেক স্বনির্ভর কটেজ । আমরা তারই একটিতে ছিলাম । খাওয়া দাওয়া খুব একটা ভালো নয় । কটেজ গুলি সুসজ্জিত । নানারকম সুবিধা রয়েছে । একটু বুনো ভাবও আছে । নেই শুধু জংলী জানোয়ার ও মূল ভূখন্ডের সঙ্গে যোগাযোগ, মাটি মারফৎ ।

পরের দিন গেলাম কন্যাকুমারিকা । পথে ত্রিবাঙ্কুরের এক রাজার একদা বাসগৃহ পদ্মনাভপুরমের কাঠের প্রাসাদ দেখলাম । খুবই সুন্দর যদিও অতি প্রাচীন স্থাপত্য ।

ভেলি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই প্রাসাদের কাঠের ওপরে কারুকার্য দেখবার মতন । পেছনে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ধ্যানমগ্ন,বিশাল পাহাড় । প্রাসাদকে আড়াল করে রেখেছে ইচ্ছে করেই । ভালই লাগছিলো । জানা গেলো কাছে আছে এক রূপসী নদী । রাজার ঘর, সভা, গুপ্ত সিঁড়ি সবকিছু দেখে লোকে বাহা বাহা করছিলো আমার মনে হল সবই ঠিক আছে কিন্তু সেই যুগে লোকেরা সময় কাটাতেন কী করে ? কোনো বাহুল্য নেই শুধু সাধারণ জীবনযাপনের সরঞ্জাম সব রাখা । পরে মনে হল আমাদের চাহিদা বোধহয় ক্রমবর্ধমান । আমার অনেক পরে যখন মানুষ এই দুনিয়ায় ঘুরবে তারাও হয়ত মনে করবে : যাব্বাবা--- শুধু মোবাইল আর ইন্টার্নেট ? ব্যস ? তাতেই এত ব্যস্ত ? সময় পেতো কী করে ? অন্য কাজের !

কন্যাকুমারিকায় তিন সমুদ্রের মিলনক্ষেত্র সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছিলাম কিন্তু বাস্তবে সেরকম কিছুই দেখা গেলোনা । জলের রঙ অস্বচ্ছ । ঘোলা । তবে ঢেউ খুব বেশি ।

বিবেকানন্দ রকে গেলাম স্টিমারে করে । খুব বিপজ্জনক যাত্রা । লাইফ জ্যাকেট পায়ের তলায় পড়ে আছে, অসংখ্য মানুষের ঢল নেমেছে স্টিমারে । একটা দিক প্রায় জলে ডুবে যাচ্ছে । খুব রিস্কি । বোঝা গেলো কেন খবরের কাগজে প্রায়ই স্টিমার ডোবার সংবাদ আসে । অর্থই অনর্থম কোন বিখ্যাত মানুষ বলে গেছেন না?

কন্যাকুমারিকার স্টিমার ভ্রমণ তার জলজ্যান্ত না না- জলমৃত উদাহরণ ।

এই পাথরের স্থানটি লোকগাথা অনুযায়ী দেবী কুমারীর পদস্পর্শে ধন্য । পায়ের ছাপ আছে কিন্তু আমি দেখিনি ।

বিবেকানন্দের ধ্যান গৃহ খুবই মনোরম কিন্তু উটকো লোকের ভীড় ও উল্টোপাল্টা গালাগাল ও চিৎকার আমার ভালো লাগছিলো না । এককোণায় অনেকক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম । পরে ফিরে আসি ।

পাড়ে পৌছাতেই ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ফোন এলো- আমার সাক্ষাৎকার নেবেন ওঁরা । লাঞ্চে আমার প্রিয় সাউথ ইন্ডিয়ান থালি খেতে খেতেই নানান কথা হল সাংবাদিক পিয়াশ্রীর সঙ্গে । জীবনে কোনো কিছুই প্ল্যান করে করিনি । আমি অন্তরে ভবঘুরে । আমার না আছে আবাসস্থল না আছে নোঙর । আমার মা আমার বাসস্থান সম্পর্কে বলেন : এখানে সবই আছে, জায়গামতই আছে - কিন্তু রাজকুমারী ঘুমিয়ে আছে ।

আজ আমারই পত্রিকার কথা লেখা হবে নামী ইংরেজি পত্রিকায় ভেবে খুব ভালো লাগছিলো । রিসর্ট থেকে পরে গেলাম বিভিন্ন বাঁধ ও অন্যান্য জায়গা দেখতে । সেই পাহাড়, জলরাশি, নৈ:শব্দ্য সবকিছু নিয়েই নানান জায়গা । বাঁধের একপাশে যখন আমরা দাঁড়িয়ে তখন একটু দূর থেকে ভেসে এলো বৃংহন । ভয়ে আমরা গাড়ি মুখো । শোনা গেলো মানসিক

ভারসাম্যহীন হস্তী। পোঁ পোঁ করে দৌড় দিলাম। আগে প্রাণে বাঁচি তারপর তো বেড়ানো !!!! তারপর যাথারীতি রিসর্ট অভিমুখে।

রিসর্টে ফিরতে হলে ঘাটে অপেক্ষা করতে হয়। নৌকো এসে তুলে নিয়ে যায়। নারকেলবনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে দেখা যায় - রং বেরংএর পাখি বসে আছে তো কোথাও দরিদ্র গ্রামবাসী। তারা ব্যাকওয়াটারের মাঝে দ্বীপে বসবাস করে বলেই মনে হল এক ঝলক দেখে। নারকেল গাছগুলি এমনভাবে জলে নুয়ে পড়েছে যে মনে হয় ঢেউয়ের তালে তালে তারা পাতা নেড়ে সঙ্গত করছে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় দোলে ময়না, বৌ কথা কও কিংবা শালিক ---- নাম জানিনা কারণ আমি পক্ষী বিশারদ নই। চোখে দেখে যা বুঝলাম তাই লিখে দিলাম। পাখি তো দেখেই সুখ, নামে কী বা যায় আসে ? আমার এখনকার বাড়িতে তো পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে। এত সুন্দর গানের গলা ওর যে মনে হয় বলি : এবার মালকোষটা ধরো তো বাছা !

ওর সুর, তান আর আমার কান। এই সবকিছুর সংযোগই বদলে দেয় প্রথম আলো। ওর নাম জানার বাসনা কোনদিন হয়নি। প্রয়োজন তো নয়ই।

ব্যাঙ্গালোরে ফেরার সময় এয়ারপোর্ট হোটেলে বোটম্যানস্ থালি খেলাম। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে মৎস্যজীবিগণ কীরূপ খাদ্য ভক্ষণ করেন তারই নমুনা মাত্র। ভালই লাগলো, মন্দ নয়। তবে কেরালাইটরা রান্নায় নারকেল তেল দেন যা অনেক মাছের সঙ্গেই আমার মতে ঠিক খাপ খায় না -তবুও যস্মিন দেশে যদাচার ভেবে খেয়ে নিলাম। ব্যাঙ্গালোরে ফিরে মন খারাপ হয়ে গেলো কারণ আবার শুরু হবে থোড় বড়ি খাড়ার জীবন। আমার মতন ভবঘুরের হাঁফিয়ে ওঠাই স্বাভাবিক।

গ্রাম্পিয়ান-স্ এর ঢেউ

দক্ষিণ পূর্ব অস্ট্রেলিয়া জুড়ে ৩৮০ মিলিয়ন বৎসর পূর্বে স্যান্ডস্টোন দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল গ্রাম্পিয়ান্স --একটি অপূর্ব পর্বতমালা। তারই একটি অংশ হলস্ গ্যাপ।

টোপোগ্র্যাফিতে যাচ্ছিনা যা নিজের চোখে দেখে এসেছি তাই লিখছি। বিস্তারিত বিবরণ দেবার জন্য উইকিপিডিয়া আছেই, অনুভূতিটা আমি দেবো। ভ্রামণিকের সেটাই কাজ।

গতবছর জুলাই মাসে আমি একবার অস্ট্রেলিয়াতে এসেছিলাম আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ উপলক্ষ্যে। বিয়ের অনুষ্ঠান চুকে গেলে আমরা যাই হলস্ গ্যাপে। কয়েকদিন ছিলাম। যাঁরা মুম্বাই ও পুণার কাছে মহাবালেশ্বরে গেছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন গ্রাম্পিয়ান্স শৈলশ্রেনী ঠিক কেমন। পাথর, শ্যামলিমা, ঝর্ণা ও ক্যাঙ্গারু। এই নিয়েই গ্রাম্পিয়ান্স। যতটা আমি দেখেছি। আমাদের রিসর্ট বেশ বড়। পৌঁছাতে রাত হয়ে গিয়েছিলো। পথে অ্যারারাটে আমার এক অস্ট্রেলিয়ান রিলেশনের বাড়িতে ডিনার খেয়ে আমরা রওনা দিলাম। ভদ্রমহিলা আমাদের সতর্ক করে দিলেন : অস্ট্রেলিয়ান সিক্রেট টা জেনে নাও, রাতে ক্যাঙ্গারু রাস্তা পার হয়। সাবধানে গাড়ি চালাবে। নাহলে সমূহ বিপদ।

আমার এক কাজিন থাকে ব্রিসবেনে। একবার ওর গাড়ি খুব বাজেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো ক্যাঙ্গারুর জন্য। সামনের কাচ ভেঙে প্রাণীটি ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলো। ভাগ্য ভালো সারথীর কিছু হয়নি। ক্যাঙ্গারুকে এখানে রু বলে অনেকে অভিহিত করেন বলে শুনেছি। এই রু এর লম্ফ ঝম্ফই যত ঝামেলা সৃষ্টি করে। যাইহোক আমাদের কোনো অসুবিধে হয়নি। অনেক রাতে নিজেদের কটেজ খুঁজে নিলাম। ভীষণ শীত। ফায়ার প্লেসে অগ্নি সংযোগ করে দিয়ে গেলো আমার ভাইয়ের স্ত্রী। দক্ষ হাতে কাঠ সাজিয়ে আগুন জ্বালাতেই বেরিয়ে এলো এক বিশালাকৃতির কাঁকড়া বিছে। এবার

আমি ক্যাঙ্গারু । লম্ফ দিয়ে সোফায় উঠে গেলাম । ভাই তখন খালি গেলাস নিয়ে ফেলুদা হবার প্রচেষ্টায় !

পরেরদিন গেলাম আশেপাশে ঘুরতে । অসম্ভব বৃষ্টি হওয়ায় প্রায় কিছুই দেখা হলনা। অল্প অল্প শিলাবৃষ্টি হচ্ছিলো । গাড়ির ওপরে দুমাদুম ইট পাটকেল পড়ার মতন শিল পড়ছিলো সঙ্গে প্রচন্ড ঠান্ডা বাতাস । যা ভালো করে দেখা গেলো তা হল একটি অ্যাব অরিজিনাল সেন্টার । অস্ট্রেলিয়ার অ্যাব অরিজিন্যাল মানুষের সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানতে একবার এখানে আসতেই হবে । তাদের জীবন যাত্রা, ব্যাবহৃত দ্রব্য, ভাষা, হাতের কাজ সম্ভবত একটি শোয়ের ব্যাবস্থাও আছে । আজকের অস্ট্রেলিয়া ওঁদেরকে বলে : আমাদের পূর্বপুরুষ । যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি দেখায় । তাঁদের অধিকার নিয়ে লড়াই করেছেন অনেক মানুষ, যাঁরা অস্ট্রেলিয়ান ।

কিছু অ্যাব অরিজিন্যাল শব্দ শিখলাম । ওঁদেরকে বলা হয় ইন্ডিজেনাস পিপেল ।

এঁদের তৈরি বিশালাকৃতি একটি বাঁশি দেখা গেলো যা তুলতে গেলে আমাকে রীতিমতন ওয়েট লিফটিং প্র্যাকটিশ করতে হবে । ইন্ডিজেনাস পিপেলদের অঙ্কিত অপূর্ব ছবি দেখা গেলো । রং এর মাধুর্য্য মন মাতায় । একটি হলুদ বাঁশির গায়ে আকাশি ও সাদার অপরূপ বিন্দু । এত বছর পরেও এত জীবন্ত যেন চিত্রকরকে ছোঁয়া যায় । দৃষ্টি নন্দন ।

স্বপ্নমাখা বাঁশি মাধুরী ছড়ায় ।

হল্‌স্ গ্যাপে একদিন লোড শেডিং ছিলো । সারাদিন ও রাত পাওয়ার ছিলোনা । প্রচন্ড ঝড়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ কেটে যায় । তাই বিদ্যুৎ ব্যাহত হয় । সেকি কষ্ট ! অসম্ভব ঠান্ডায় হিটার চলছে না । ফায়ার প্লেসের কাঠও নি:শেষ প্রায় । চা খাওয়া যাচ্ছে না । খাবার পাওয়া যাচ্ছেনা, সমস্ত হোটেল বন্ধ । একটি কোণায় শুধু একটি কাউন্টারে গ্যাসের উনুন জ্বেলে সসেজ ও বিফের টুকরো ভাজা হচ্ছে সঙ্গে পাউরুটি । যার যত খুশি খাও এরকম নয় । খাবারের রেশনিং হচ্ছে যেন কারণ বিদ্যুৎ নেই । কখন আসবে কেউ জানেনা । কাজেই কিছুটা খাদ্য সংগ্রহ করে রাখতে হবে । বিদেশে এই

ধরণের ঘটনা দেখে আমার খুব মজা লাগছিলো। পরে জানা গেলো এরকম ঘটনা খুব একটা হয়না। প্রকৃতির রোষকে আজও মানুষ বাগে আনতে পারেনি তাই মাঝে মাঝে এরকম হয়ে যায়। আমি একটু রসিক মানুষ। তাই এই চূড়ান্ত বিপর্যস্ত অবস্থাতেও হাসি থামাতে পারিনি।

দিনের বেলায় অন্য শোভা। ঘরের পেছনে বিরাট কাচের দরজা। প্রায় পুরো দেওয়াল জুড়েই। সেখান দিয়ে একটি ক্যাঙ্গারু এসে মুখ বাড়িয়ে দেখছিলো আমাদের। ওর পোলাপানেরা এলো। উঁকি ঝুঁকি মারলো। তারপরে লাফ দিয়ে চলে গেলো এক এক করে। জীবনে অনেক জন্তু দেখলেও এই জিনিস আমার কাছে নতুন। তাই বেশ উৎসাহ নিয়েই দেখছিলাম। ভাইয়ের স্ত্রী জানতে চাইলো রুয়ের মাংস খাবো কিনা।

সবিনয়ে নিবেদন করলাম যে খাবো না। কারণ এই মাত্র ওদের জ্যান্ত দেখে যে আনন্দ পেলাম তা ধরে রাখতে চাই। এক্ষুনি নাই বা খাবারের প্লেটে টেনে আনলাম!

জীবন আর মৃত্যুর মাঝে যে এত সুক্ষ্ম ফারাক তা কি বেচারা রু-রা জানে? জানলে হয়ত ঐভাবে এসে আমাদের পর্যবেক্ষণ করতো না।

হলস্ গ্যাপ থেকে ফেরার পথে গেলাম একটি প্রাইভেট চিড়িয়াখানা দেখতে। এক দম্পতি এই জু তৈরি করেছিলেন প্রকৃতির কোল ঘেঁষে।

সেখানে অনেক আজব জন্তু দেখা গেলো। অস্ট্রেলিয়াতে জন্তু জানোয়ার একটু ভিন্ন ধরণের। দেখে মজা লাগলো। কয়েকটি হরিণ আমাদের পিছু ধাওয়া আরম্ভ করলো সম্ভবত খাবারের আশা। ক্ষুদ্র এক প্রজাতির বাঁদর দেখলাম তার আকার একটি স্কেলের মতন। তরতর করে ছোট গাছ বেয়ে উঠে যাচ্ছে। ওরা আরশোলা খায়।

উট পাখি, ক্যাঙ্গারু, জিরাফ, এমু, নানান সুন্দর সুন্দর পাখি দেখা হল।

ফেরার পথে দাবানলে ক্ষতিগ্রস্ত অনেক গাছপালা দেখলাম। কালো হয়ে আছে।

নিজ শহরে ফিরে গেলাম একদিন ওপেন এয়ার গোল্ড মিউজিয়াম দেখতে। ওঁরা বলেন : স্যুভেরিন হিল। ওঁদের ভাষায় নিচে লেখা যায় ::

Australia's foremost outdoor museum, Sovereign Hill re-creates Ballarat's first ten years after the discovery of gold in 1851 when thousands of international adventurers rushed to the Australian goldfields in search of fortune.

By day, Sovereign Hill is where Australia's history comes to life! It's just like stepping back in time - from the hustle and bustle of Main Street where costumed ladies and gents parade their new-found wealth, to the excitement of the Red Hill Gully Diggings where you can pan for real gold and it's yours to keep!-(Info: Wikipedia)

একটা সময় এখানে অনেক চৈনিক শ্রমিক এসেছিলেন খনির কাজে। গেটে পৌঁছে জানা গেলো পুরোটা দেখতে একের বেশি দিন সময় লাগবে। আমরা ঠিক করলাম পরে এসে ধীরে সুস্থে দেখা যাবে কারণ আমাদের হাতে সময় ছিলনা। কেবল সন্ধ্যায় একটি লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো হয় সেটা দেখা হবে।

অস্ট্রেলিয়া ভিন্ন মহাদেশ তাই এখানে জুলাই মাসে অসম্ভব ঠান্ডা। ডিসেম্বরে গরম।

প্রচন্ড শীতে অনেক গরম জামা নিয়ে শো দেখতে গেলেও আমরা ঢুকতে পারিনি। কারণ হলিউড সুপারস্টার টম ক্রুজ ও তাঁর স্ত্রী কেটি হোমস্ এসেছিলেন শোতে। লোকের চাপে রাস্তাঘাট দমবন্ধ করে আছে। ভীড় উপচে

পড়ছে মাইল খানেক দূর থেকেও দেখা যায়। শহরে একটিও ট্যাক্সি নেই। সব ভাড়া চলে গেছে স্যুভেরিন হিলে।

কাজেই আমাদের শুন্য হাতে ফিরে আসতে হল।

কয়েকদিন পরেই দেশে ফেরা তাই সেই যাত্রায় ওখানেই সমাপ্তি। ভ্রমণের।

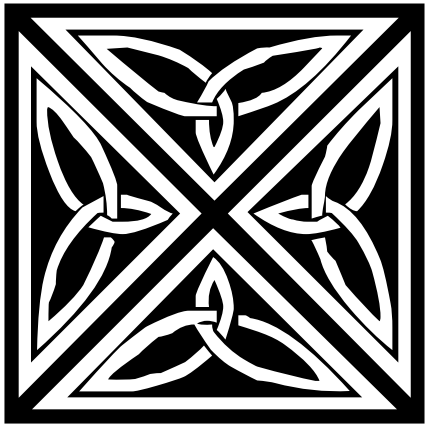

গ্রেট ওশিয়ান রোডে সোনার সফর

The Great Ocean Road is a 243-kilometre (151 mi) stretch of road along the south-eastern coast of Australia between the Victorian cities of Torquay and Warrnambool. The road was built by returned soldiers between 1919 and 1932, and is the world's largest war memorial; dedicated to casualties of World War I. It is an important tourist attraction in the region, which winds through varying terrain alongside the coast, and provides access to several prominent landmarks; including the nationally significant Twelve Apostles limestone stack formations……..

উইকিপিডিয়ায় এইটুকু পড়ে একটু দম নিলাম । যাবো গ্রেট ওশিয়ান রোড দেখতে তাই একটু জেনে নিচ্ছিলাম ওর সম্পর্কে । শুনেছি বিশাল রাস্তার অনেকটাই সমুদ্রের ধার দিয়ে ও কিছুটা বৃষ্টিবনের মধ্যে দিয়ে যাকে বলে রেন ফরেস্ট । সুদৃশ্য, মনোরম ।

মাখনের মতন হলেও কিছু জায়গায় উঁচু নিচু থাকায় বেশ স্টিপ । আমার সঙ্গে অবশ্যই তিনজন চোস্ত ড্রাইভার । কাজেই অসুবিধে নেই । সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম । পথে কফি ও ব্রেকফাস্ট সেরে লম্বা যাত্রা । গানের তালে তালে চলেছি গ্রেট ওশিয়ান রোড ধরে । আমি ব্যাঙ্গালোর থেকে গোয়া গেছি ঠিক এরকমই এক রাস্তা দিয়ে কাজেই আমার খুব ভালো লাগছিলো । মৃদুমন্দ সমীরণ, খোলা মাঠ, সর্ষেক্ষেতের সোনা রোদ্দুর, লাল লাল নাম না জানা ফুলের দৃষ্টিনন্দন বাগিচা সমস্ত মিলিয়ে ভারি মন ভালো করা । সূর্যমুখী বাগানো বুঝি দেখা গেলো । পাহাড় পেরিয়ে জঙ্গল । বৃষ্টি পড়ছে ঝিরি ঝিরি ।

পৌঁছালাম অ্যাপোলো বে বলে একটি ছোট জায়গায় । হোটেলে হোটেলে ছয়লাপ ।

সমুদ্রের নীল গর্জন ও স্বল্প বসনা, নীল নয়নার আনাগোনা বেশ উপাদেয় ।

এনে দিলো চিংড়ি ভাজা ও চা । মশলা চা । এখানে এখন বিরিয়ানি ও মশলা চা অনেক জায়গায়-ই মেলে । ভারতীয় দোকান না হলেও ।

মশলা চা নিয়ে মশলার উদ্দেশ্যে বাইরের বড় কাচের জানালা দিয়ে তাকালাম ।

ছোট বড় মানুষ সার বেঁধে চলেছেন । কেউ সাদা চামড়া, কেউ বাদামী, কেউ হলদেটে কেউ বা আমার মতন কালো মানুষ । কালো-ই বটে ! যাকে বলে আবলুস কাঠ ।

চোখ নাক মুখ কিছুই দেখা যাচ্ছে না । হয়ত বিদেশী পর্যটক !

গ্রীক মানুষেরা খুব সুন্দর । অস্ট্রেলিয়ান মেয়েরা খুব আকর্ষক । রূপার চুড়ি, পায়ে আঙট, কানে মাকড়ি, নাকে নাকছাবি --- দারুণ লাগে ! যাদের চুল কালো তাঁরা তো অপরূপা ! আমার এক আত্মীয়া আছেন ঠিক এরকমই রূপসী । আমি তাঁকে ঘুরে ঘুরে দেখি !

বোধহয় বলেও ফেললাম : ডোন্ট থিংক আই অ্যাম সিক । জাস্ট ইউ আর লাভলি !

হেসে চলে যান এইকথা শুনে । বলতে বলতে যান : আই নো ইউ আর আর্ট লাভার ।

গ্রেট ওশিয়ান রোডে গিয়ে বেশ কিছুদিন থাকলে ভালোলাগবে । আমরা খ্রীস্টমাসে যাবো অ্যাডিলেডে বেড়াতে । এই প্রথম গরমে খ্রীস্টমাস দেখবো । খুব উত্তেজিত আমি।

পরে আসবো ওশিয়ান রোডে । আসলে এখান থেকে কাছেই ফিলিপ আইল্যান্ড । সেখানে আছে বিশ্বের সবথেকে ছোট পেঙ্গুইন । পরী পেঙ্গুইন । তাকে দেখার ইচ্ছে প্রবল । ওশিয়ান রোডে ড্রাইভটাই জমাটি । যাঁরা লং ড্রাইভ প্রেমী তাঁদের ভালো লাগবে ।

Bugatti নাহলে নিদেন পক্ষে একটা বি এম ডাবলু ------ জমে যাবে !

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় এক অদ্ভুত মিষ্টি সুবাসে ও আওয়াজে মনটা ভরে গেলো । মনে হল কোনো অরণ্য কন্যার আলতা পায়ের আলতো ছোঁয়া পড়ছে কচি ঘাসে । তাতেই বেজে উঠছে সবুজ সবুজ আলো । যেই আলোর দিকে চেয়ে ভুলে যাওয়া যায় সব দু:খ । অপার্থব আলো পড়ে আছে বনের হেথায় সেথায় । কুড়িয়ে নিয়ে ব্যাগে ভরলাম । আমার মনখারাপের তিথির জন্য । জানা গেলো এই অরণ্যের বিশ্বের অনেক উঁচু উঁচু গাছ রয়েছে । সমুদ্রের দিকে আছে জাহাজডুবি নানান ঘাট । বহু জাহাজের প্রাণঘাতী যাত্রা শেষ হয়েছে এই উপকূল বরাবর । সেসব সময় করে দেখা যেতে পারে । এবারে শুধুই উপকূলবর্ত্তী পথ ধরে মধুরিমা ছড়ানো । জলে অগ্নুৎপাত অন্যসময় দেখা যাবে । জলেরেখা বেয়ে উঠে আসে মৃত নাবিকের দীর্ঘশ্বাস ! নোনা পাতায় ভেসে বেড়ায় চাপা ক্রন্দনের সুর ।

-উ-উ-ই-ই-ই-ই-ই-!!

কানপাতলে আমি শুনতে পাই । যদিও পতিদেব বললেন : গাছের কোটরে হাওয়া ঢুকে এরকম অদ্ভুত শব্দের সৃষ্টি করছে । ফেরার সময় অনেক রাত হয়ে গিয়েছিলো । তাই বাকি রাস্তা ভালো করে দেখা যায়নি । শুধু আকাশে দেখেছিলাম বহু উজ্জ্বল নক্ষত্র । পরিষ্কার আকাশ, পাল্লা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস যেন মনে করিয়ে দেয় এই গ্রহের বাইরের তাপমাত্রার কথা । আকাশের দিকে তাকালে ভুলে যাওয়া যায় দৈনন্দিন টানাপোড়েন । এক কাপ গরম কফি হাতে আমি দাঁড়িয়ে এক রেস্তোরাঁয় । রেস্তোরাঁ থেকে একটু হেঁটে গেলে দেখা যায় বিখ্যাত লেবুপাথর (চুণাপাথর) দিয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট ভাস্কর্য –

Twelve Apostles limestone stack formations—

রক ফর্মেশানের দিকে বাতাসের তীব্রতায় বেশিক্ষণ থাকা গেলোনা । নিচে দেখা যায় জলরাশি বয়ে চলেছে আপন মনে । পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে

ভেঙে যাচ্ছে আবার নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে একই খেলায় মেতে উঠছে। এই ভাঙাগড়ার খেলা দেখে মনে পড়ে মানব সভ্যতার কথা। জলের বদলে মানুষ বসিয়ে দিন ! এখানে মানুষজন বাড়িতে নৌকো রাখেন। তার তলায় চাকা লাগানো। গাড়ির ওপরে করে কিংবা পেছনে লাগিয়ে সেই নৌকো ও সার্ফ করার বোর্ড নিয়ে তাঁরা যান সমুদ্রে। খেলে বেড়ান জলের ওপরে। চেটেপুটে খান জীবন। আমি যে মেলবোর্নে বাড়ি কিনলাম সেখান থেকে হাঁটা পথে সি বিচ। আমার পড়শীর বাগানে রয়েছে যথারীতি একটা সাদা স্পিড বোট। জানা গেলো আমার নতুন পাড়ায় বেশির ভাগ মানুষই সার্ফ করেন। পৃথিবীর সবথেকে বড় দ্বীপ বোধকরি এই দেশটাই। অস্ট্রেলিয়া খুব সুন্দর। আরো সুন্দর তাসমানিয়া, অস্ট্রেলিয়ার ছোট্ট দ্বীপ। তার থেকেও সুন্দর নিউজিল্যান্ড। এখনো যাওয়া হয়নি। বছর আড়াই এর আগে যাওয়া যাবেনা। আমাদের দেশের বাইরে যাবার উপায় নেই আগামী আড়াই বছর। তাহলে পিছিয়ে যাবে সিটিজেনশিপ অনুষ্ঠান। আগামী আড়াই বছর অস্ট্রেলিয়াতেই ঘুরবো। অনেক কিছু দেখার আছে।

মরুভূমি, অ্যালিস স্প্রিংস্, খনি এলাকা, ব্রিসবেন বিচ, প্রায় মধ্য অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাব অরিজিন মানুষের কাছে পবিত্র উলুরু রক ফর্মেশান (সিঙ্গলে স্যান্ড স্টোন ও ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ) আরো কত কি !

আমার মতন ভ্যাগাবন্ডের ঘুরতে কারণ লাগেনা। যা লাগে তা হল প্রচন্ড ব্যস্ত এক্সিকিউটিভ স্বামীর মূল্যবান সময়। সেটুকু পেলেই দুজনে পালিয়ে যাই চেনা গন্ডী ছেড়ে। কারণ উনিও ভ্যাগাবন্ড। বা বলা ভালো ভূপর্যটক ! ইচ্ছে আছে অ্যান্টার্টিকা যাওয়ার। দেখা যাক। কাছেই তো !

কে বলে অ্যাফ্রিকায় নেকড়ে নেই ? গুগুলে দেখলাম। ভাই আগেই একটি ডকুমেন্টারি দেখে আমাকে ক্ষেপাচ্ছিলো !-কী রে সত্যজিৎ দাদু (আমার ঠাকুমার দিকে একটা সম্পর্ক আছে, ময়মনসিংহের মানুষ তাঁরা) তো পাপিছলে আলুর দম !অ্যাফ্রিকায় দিব্যি নেকড়ে আছে। তবে সংখ্যায় কম।

মিষ্টি করে হেসে বললাম : তখন তো গুগুল ছিলোনা .

গুগুল তথ্য::

Simien Mountains, Ethiopia-The Ethiopian wolf (Canis simensis), also known as the Abyssinian wolf, Abyssinian fox, red jackal, Simien fox, or Simien jackal is a **candid** native to **Africa**.

ঘোস্ট হান্টিং ট্যুর

অনেকদিন ধরেই ঘোস্ট হান্টিং ট্যুরের কথা শুনছি। দেখতে যাবার ইচ্ছে প্রবল কিন্তু ক্রমাগত বর্ষণের জন্য যাওয়া হচ্ছিলো না। আমি যেই শহরে আছি এটি অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে হন্টেড শহর কাজেই ভৌতিক কান্ড কারখানা ভালই হয়। গোল্ড রাশের সময় এখানে অনেক খুন খারাপি হয়েছে। প্রেতাত্মারা আসে, আজও। বছর ঘুরে নতুন বছর আসে -হানা দেয় অশরীরীরা।

ঘোস্ট হান্টিং ট্যুর হল বিভিন্ন ভৌতিক স্থানে গিয়ে প্রফেশন্যালি ভূতের সন্ধান করা। আপাত দৃষ্টিতে অনেকের মনে হতে পারে : এসব পাগলামো ।

কিন্তু সাইকিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এর গুরুত্ব ততটাই যতটা সাধারণ ছাপোষার টিভি দেখা কিংবা সিডি শোনা। দুনিয়ায় হরেক রকমের মানুষ। কেউ সাইকিক কেউ বৈজ্ঞানিক। একে ওপরকে হেয় করতে পারেন কিন্তু প্রত্যেকের নিজস্ব চাহিদা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে পারেন না। তাই কখনো কখনো বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে যান ভূত দর্শনে।

আমার এক ভাইয়ের স্ত্রী অস্ট্রেলিয়ান। তাঁর কাছে জানা গেলো যে এখানে তিনরকমের ট্যুর হয়। একটি গাড়ি করে (হর্স ক্যারেজ) দ্বিতীয়টি হেঁটে হেঁটে নানান ভৌতিক স্থান দর্শন ও শেষটি কবরের মধ্যে গিয়ে ভূত দেখার চেষ্টা।

শতকরা কজন সফল দর্শক আছেন জানিনা তবে গাইড বললেন যে অনেকেই যাঁরা একটু বেশি সেন্সিটিভ তাঁরা ভূতের দেখা পেয়ে থাকেন। অনেকে ভয়ও পান।

রোদের মধ্যেই রাত ৯টার সময় (এখানে এখন সামার তাই সন্ধ্যে হয় ১০টার পরে) আমরা স্টেশান থেকে একজন গাইডের সঙ্গে হন্টন দিয়ে রওনা হলাম ভূতের সন্ধানে। টানা ২ ঘন্টা হাঁটতে হবে। আমি রোজ ঘন্টা খানেক ট্রেডমিল করি তাই অভ্যাস আছে তবুও শেষদিকে আর পারছিলাম না ! চড়াই উৎরাই বেয়ে ওঠা নামা করা ইত্যাদিতে বেশ কাবু হয়ে পড়েছিলাম।

প্রথমেই নিয়ে গেলো একটি অন্ধ গলিতে। দুই পাশে সুউচ্চ বিল্ডিং। দম বন্ধ হয়ে আসছে। সেখানে একটি অত্যন্ত খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম পুরাতন মহলে। জানা গেলো আগে এইসব জায়গা নিচু ছিলো। পরে বন্যায় ভূমির উচচতা বদলে গেছে। আমরা উঠলাম একটি বদ্ধ ঘরের কাছে। সিঁড়ি অত্যন্ত বিপজ্জনক ও সরু। বহু যুগ পুরনো বোঝাই গেলো। অবশেষে এলাম একটি জায়গায় যেখানে পুরাতন উনুন রাখা। আগে এটি ছিলো বেকারি। সেই উনুনে কোনো বেকিং আজ হয়না তবুও বহু মানুষ গন্ধ পান। যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা বলে দিতে পারেন কি কি বস্তু দিয়ে বেক করা হচ্ছে। গাইড খুলে দেখালেন : উনুন সাফ সুতরো,কিচ্ছুটি নেই।

জানা গেলো একজন মহিলা এখানে বাতাসে ভাসমান ঘড়ি দেখেছেন।

কেউ কেউ লাইনের পাশে অদৃশ্য ছায়া দেখতে পান। তবে আমরা কাউকে দেখিনি।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে গাইডের জ্ঞান দেখে হতবাক। কত জানেন ইনি !

বলছেন : আমরা পাঁচ ইন্দ্রিয় দিয়ে নিজেদের জগৎ তৈরি করেছি কিন্তু সাইকিকদের আরো বেশি ইন্দ্রিয় সজাগ থাকে তাই তাঁরা অন্য মহাবিশ্বের সঙ্গেও যোগ স্থাপন করতে পারেন।

গাইডের সঙ্গে ছিলেন তাঁর সঙ্গী। একজন ভৌতিক পোষাকে সুসজ্জিতা ভদ্রমহিলা।

আবহ তৈরি করতে এঁদের জুড়ি নেই । ভদ্রমহিলাকে দেখলে ভয় পেয়ে যাবেন মানুষ । এমনই সেজে এসেছেন । চোখ মুখের এক্সপ্রেশান ভয়াবহ । আছেন এক্সট্রা হিসেবে । কোনো ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে ওঁনাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে । কারণ গাইড বিরাট দলের অগ্রভাগে । ইনি পেছেন বা মাঝামাঝি ।

দ্বিতীয় স্থান হিসেবে দেখা গেলো একটি ব্যাংক । একটি মেয়ে ওখানে নিয়মিত দেখা দেয় । বিয়ের কথা ছিলো এক ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের পুত্রের সঙ্গে কিন্তু সাধারণ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ী Maid servant -বলে পিতা রাজি হননি । বিয়ের সময় পুত্র বেপাত্তা । মেয়েটি আত্মহত্যা করে । ব্যাঙ্কের ওপরে সে সপরিবারে থাকতো । কাজেই সন্ধ্যের পরে উপদ্রব শুরু হত । যেসব কর্মীরা কাজ করতেন তাঁরা দেখতেন বিভিন্ন অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে । যার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই ।

তৃতীয় স্থান একটি রেস্তোরাঁ । সেখানে রাগী ভূত বাস করতো *Poltergeist* – রাতের বেলা জিনিস পত্র ছুঁড়ে ফেলা ও টেবিল চেয়ার উল্টে দেওয়া এইসব হত । একটি কমবয়সী মেয়েকে আত্মাটি টার্গেট করেছিলো । তার পেছন পেছেন যেতো । বিরক্ত করতো । নিজের থেকে আলো জ্বলে যেতো, জিনিসপত্র ভাঙচুর । এখন রেস্তোরাঁটি হস্তান্তরিত হয়ে বদলে গেছে । হয়ত ধর্মীয় কোনো অনুষ্ঠান পালন করা হয়েছিলো । বিভিন্ন কাহিনী বলে যেতে লাগলেন গাইড । মাঝে মাঝে ভৌতিক স্থানে হুঙ্কার ও লম্ফঝম্ফ দেওয়া এবং বিভিন্ন জেস্চার করা দেখে ভয় লাগতে পারে !

চার নম্বর স্থান একটি হোটেল । বিখ্যাত হোটেল । সেখানে মার্ক টোয়েন ছিলেন । ইংল্যান্ডেশ্বরী ছিলেন । তারই একটি বিশেষ ঘরে উৎপাত হয় । ঘরে ঢুকে একদিন এক ব্যাক্তি পোশাক পাল্টানোর সময় দেখেন একজন মানুষ হেঁটে বেড়াচ্ছেন । লোকটি লজ্জা পেয়ে যান । কারণ উনি তখন নিরাবরণ হয়ে কাজ করছিলেন । চীৎকার করতে করতে বেরিয়ে পড়েন ঘর থেকে সেই আর্কিমিডিসের ইউরেকার মতন । পরে জানতে পারেন ওখানে স্পিরিট আছে ।

এরপরে গেলাম টাউন হল দেখতে । সেখানেও ভূতের বাস শতাব্দীকাল ধরে ।

এখনও নাকি দেখা মেলে । মাঝে মাঝে । এইভাবে বিভিন্ন স্থান পায়ে হেঁটে প্রদর্শন । শেষে গেলাম একটি ফাঁসি দিতো এরকম জায়গায় । ঢোকার মুখে বহু পুরাতন লোহার গেট খোলার সময় অদ্ভুত শব্দে আমরা চমকিত । ভয়ে একে ওপরকে জাপটে ধরেছি । সেখানে কয়েদীদের রাখা হত । অত্যন্ত কষ্ট দিয়ে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হত । আজও সেখানে দেখা যায় প্রেতকূল, কেউ কাঁদে কেউ হাসে কেউ কথা বলে যায় এক মনে । অমাবস্যা রাতে হয় নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ ।

উপরি স্থান হিসেবে দেখলাম চার্চ । এবার পাদ্রী ভূত । শোনা যায় লোকেরা এক পাদ্রীর সঙ্গে ধর্মীয় শলাপরামর্শ করেন । আসলে উনি কায়াহীন ।

একদম শেষে গাইড বললেন : এই শহর সবথেকে ভৌতিক শহর কাজেই রোজই আমাদের কাছে ফোন আসে যে স্পিরিট উৎপাত করছে । আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আগে সাইকোলজিস্টকে পাঠাই । যদি দেখি মেন্টাল কেস নয় তখন স্পিরিট তাড়াতে এক্সপার্ট ও সাইকিকরা যান । মানে সোজা কথায় ওঝারা যান । এই শহরে নাকি বেশির ভাগ এলাকাতেই ভূত আছে । যাঁরা সংবেদনশীল তাঁরা অনুভব করতে পারেন । লেখিকা অজানা মেলবোর্নেই থাকেন । ওঁনার পুত্র বড় ডাক্তার । ওঁরা দুজনেই ভূত দেখতে পান । ভদ্রলোক দেখেন যে মৃত রুগী হাসপাতালে বসে আছেন কিংবা ঘুরছেন।

আমার এক ভাইও (দুই ভাই) মেডিক্যাল লাইনে আছে । সে যেখানে কাজ করে সেই বেস হসপিট্যালে বেড নম্বর ৫- এ নাকি ভূত আছে । বহু ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্স ওখানে ভূত দেখেছেন । ওটা আই সি ইউ তে ।

বিজ্ঞান তো আজকাল বলে : জড় বস্তু বলে কিছু নেই -সবই শক্তি ।

হয়ত ভূতও এক শক্তি যার সম্পর্কে আমরা সাধারণ মানুষেরা এখনও তেমন কিছু জানি না । বিজ্ঞানের অ্যাপ্রোচটা খুব ক্লোজড। তাই সবকিছু

জানতে কী পারবো কোনোদিন ? মহাবিশ্ব রহস্যময় । আরো রহস্যময় আমাদের মন । চাওয়া পাওয়া ।

তাই বুঝি দেহ রাখার পরেও কেউ কেউ ফিরে ফিরে আসেন মানবজমিনে ।

ধোঁয়া ধোঁয়া, কুয়াশা মোড়া ---সেই চাওয়া পাওয়ার পরিপূর্ণতার আশায় ।

কথায় বলে ব্রুটাল ডেথ ও আনটাইমলি ডেথ এই দুটো জিনিস মানুষকে স্পিরিট করে । নর্মাল মৃত্যু করেনা । কাজেই উৎপাত কারি বা বন্ধু স্পিরিট সব সময়ই বাসনাজাত । তাহলে বৃদ্ধ বৃদ্ধা ভুতের দর্শন মেলে কেন ?

হয়ত মরণের পরেও তাঁরা রয়ে যান এখানে কারণ বয়স হয়ে দেহ গেলেও যায়না উর্দ্ধগামি বাসনা ।

বাসনার ভার নামিয়ে আনে ধরাতলে, অপরাহ্নের আলোদের ।

পরবর্তী কালে অস্ট্রেলিয়ার বহু স্বনামধন্য মিডিয়ামের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য হয়েছে বলে ভৌতিকতা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি । স্পিরিট ওয়ার্ল্ড ও তার ব্যাখ্যা পেয়েছি ।

বলিউডি কোরিওগ্রাফার সিয়ামাক ডাভারের স্পিরিচুয়াল গুরুর দুই পুত্র স্পিরিট দুনিয়া থেকে এসে একটি বই লেখেন ওদের মায়ের মাধ্যমে । মা ছিলেন মিডিয়াম ।

সেই বইয়ের নাম লওস অফ স্পিরিট ওয়ার্ল্ড । তাতে বিস্তারিত পড়ার সুযোগ হয়েছে ।

অপরূপ অ্যাডেলেড

খ্রীস্টমাস আসতেই আমি মহাখুশি । যাচ্ছি অ্যাডিলেড । শুনেছি এই শহর শিল্পকলার জন্য বিখ্যাত । পথের ধারে পাবের দেওয়ালে অঙ্কিত অপুর্ব চিত্র । একই সঙ্গে অপুর্ব আর্ট গ্যালারি, মিউজিয়াম সব মিলিয়ে চমৎকার ।

সকালের বাসে রওনা দিলাম অ্যাডিলেড অভিমুখে । বাসটি খুব বড় ও আপদ মস্তক কাচের জানলায় ঢাকা । আমরা সামনের দিকে সিট নিয়ে বসলাম । অ্যাডিলেড পৌছাতে লাগবে মোট ১০ ঘন্টার মতন । মাঝখানে খাওয়ার জন্য বাস দাঁড়াবে দুইবার । একবার লাঞ্চ ও পরে স্ন্যাক্স । সুন্দর সবুজ ক্ষেতখামারের মধ্যে দিয়ে রওনা দিলাম । চলেছি তো চলেছি । কত অপরূপ পাখি দেখলাম । লাল মাথা নীল ঝুটি, সোনার বরণ কালো ময়না, গাঢ় সবুজ টিয়া, শ্বেত কপোত --------

ড্রাইভটা খুব সুন্দর । আশেপাশের দৃশ্য ছাড়াও বাসের দুলুনি বেশ লাগছিলো ।

ভলভো বাস বলেই বোধহয় এত সুখদায়ক । একটা সময় পৌছালাম হর্সাম ।

বেশ পরিপাটি শহর তবে কিছু কলকারখানা চোখে পড়লো । বাড়িগুলি এত সুন্দর যে আমি ও পতিদেব ঠিক করলাম এখানে এসে কিছুদিন বাদে থাকবো ।

দুপুরের খাবারের জন্য দাঁড়ালাম একটি পেট্রল বাঙ্ক লাগোয়া রেস্তোরাঁতে । সুন্দর ব্যবস্থা । চটজলদি কিছু নিয়ে আবার রওনা । বাইরে দাঁড়িয়ে অনেক বড় বড় লরি ও ভারী মালবাহী ট্রাক । রাগেট হলেও খুবই দৃষ্টি নন্দন । যেমন রং তেমনই ওদের দৈহিক গঠণ । আমাদের দেশে কেন যে অ্যাসথেটিক্সকে গুরুত্ব দেওয়া হয়না এই সব বিষয়ে জানিনা । ভারতেই তো আছে তাজমহল ও কোনারক, খাজুরাহো কিংবা দিলওয়ারা মন্দির ।

কাজেই ট্রাক কি দোষ করলো ? যন্ত্রের মাঝে অযান্ত্রিককে খুঁজে নিতে সমস্যা কোথায় ? বিদেশের এই সুন্দরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিদান আমার খুব ভালোলাগে। প্রতিটি ছোট ছোট জিনিসে এত মাধুর্য্য মন ভরায়।

অর্থটা বোধকরি সমস্যা নয় কারণ অত্যন্ত দরিদ্র আদিবাসীদের গৃহে দেখা যায় সুচারু আলপনা কিংবা দেওয়াল অঙ্কন।

আবার যাত্রা শুরু। কফির কাপ নিয়েই ছুট্টে বাসে উঠে পড়লাম।

যেতে যেতে পথে আবার দাঁড়ালাম বৈকালিক স্ন্যাকসের জন্য। তার আগে অবশ্য এক বিপত্তি হল। বাসটি অসম্ভব বড় হওয়ায় ও ভুল রাস্তায় চলে যাওয়ায় (ড্রাইভার এই রুটে নতুন) ঘোরাবার সময় রাস্তার পাশে কাদায় আটকে গেলো।

খুব দুলছিলো পুরো বাসটি। মনে হচ্ছিলো এক্ষুনি উল্টে যাবে। অনেক ক্ষণ ধরে চেষ্টার পরে দেখা গেলো বাস মূল রাস্তায় উঠতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তার আগে সমস্ত চলমান গাড়ি লাইন দিয়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে। চালকেরা নেমে এসে জানতে চাইছেন : আর ইউ অলরাইট ? কারো কোনো আঘাত লাগেনি তো !

এই বোধহয় পরবাস। এখানে মানবতার সত্যি দাম দেওয়া হয়। তবুও কিছু কিছু এশিয়ানের সঙ্গে যখন কথা হয় তাঁরা ক্রমাগত নালিশ করতে থাকেন দেশটার বিরুদ্ধে। এখানে তো ভারতীয় মানেই পাঞ্জাবী। অথবা দক্ষিণী।

এক পাকিস্তানি খুব জোরের সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে এখানে থাকা যায় না মোটেই কারণ এঁদের সামাজিক নিয়ম কানুন মানা মুস্কিল। স্বল্পবসনা মেয়ে ও তাঁদের খোলামেলা আচরণ রীতিমতন বিরক্তিকর। ইসলাম এসব মানেনা -পরিমিত যৌন জীবন ও উচ্ছৃংখলতা এই তো বিদেশ !

মুখ ফসকে বলেই ফেলেছি : তাহলে এখানে আছেন কেন ?

মেয়েদের বোরখাবন্দিনী না করলে জাতি এগোয় না, তাই না ?সারা দুনিয়া জুড়ে ক্রমবর্ধমান ইসলামিক টেররিজম নিয়ে আপনার চিন্তা ভাবনা কী ?

ভদ্রলোক আর কথা বাড়ান নি।

সাহেবদের দেশের সমস্ত সুবিধে নেবো আর দাঁড়িও উপড়াবো এই জিনিসটা আমার ঠিক বরদাস্ত হয়না। যাইহোক সন্ধ্যায় পৌছালাম অ্যাডলেড। বেশ সুন্দর জঙ্গল ও পাহাড় ডিঙিয়ে। শহর তো নয় যেন শিল্পীর তুলিরেখা। অপরূপ। পরিচ্ছন্ন। বিশাল বড় কিছু নয়, গোছানো। পরিপাটি। বিল্ডিং গুলি দেখবার মতন।

আমাদের আর সি আইয়ের হোটেল শহরের মধ্যস্থলে। ঢুকতেই এত্তো সুন্দর বিমূর্ত কিছু চিত্র দেখলাম যে মন জুড়িয়ে গেলো। বিমূর্ত চিত্র ও ভাস্কর্য অদ্ভুত আনন্দ দেয়। আমাদের ঘর মানে অ্যাপার্টমেন্ট তিনতলায়। শোবার ঘর, ড্রয়িং রুম, কিচেন, বারান্দা, গেস্ট রুম, লিভিং রুম সমস্ত নিয়ে এলাহি ব্যবস্থা। যেন আরেকটি বাড়ি। তবে একটু ছোট আকারের ঘর। পুরো নীল রংয়ের মেঝে ও দেওয়াল। হলুদের শেডে আসবাবপত্র ও পর্দা। দৃষ্টিনন্দন। জানা গেলো ইচ্ছে করলে হার্বাল মাসাজ ও আরো সুখপ্রদ সার্ভিস নেওয়া যাবে। আমরা মোট চারদিনের জন্য যাওয়াতে এগুলো নেবার ফুরসৎ পাইনি। ডিনার খাবার জন্য তৈরি হয়ে গেলাম পাশের একটি ইতালিয়ান কাফেতে। বিশেষ কারণে প্রায় সব দোকান সেদিন বন্ধ ছিলো। পিৎজা খেয়ে ও নিয়ে ঘরে ফিরলাম। ভারতের ক্রিকেট ম্যাচ দেখে সেদিনটি কেটে গেলো।

পরেরদিন গেলাম শহরের মধ্যেই আর্ট গ্যালারি ও মিউজিয়াম দেখতে।

একটি বাস শহরের সমস্ত টুরিস্ট স্পটে নিয়ে যায় ফ্রিতে। সেই বাসে করে আমরাও গেলাম। মিউজিয়াম ইত্যাদিতে ঢুকবো কি স্থাপত্য দেখেই চোখ জুড়িয়ে গেলো। এত্তো সুন্দর করে কে বানিয়েছেন ? মানানসই গাছ পালা, রাস্তার রং। অপূর্ব।

মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারিতে অনেক স্থাপত্য দেখলাম, চিত্র দেখলাম। বিভিন্ন দেশের সমস্ত আর্ট ওয়ার্ক রয়েছে। ইরাণ, ভারত, মিশর আরো নানান স্থানের।

খুবই চিত্তাকর্ষক। ছবি তুললাম। ফ্ল্যাশ অন করা বারণ থাকায় কিছু ছবি কালো কালো হয়ে গেলো। যতদুর মনে পড়ছে হাতির কঙ্কাল, ডাইনোসারের কঙ্কালও দেখেছি। ছোট ছোট ফসিল বিক্রি হচ্ছে গিফট্ হিসেবে। বেশ সুন্দর ও ইউনিক। এরকম প্রাগৈতিহাসিক উপহার আগে দেখিনি। এত সুন্দরভাবে এঁরা এগুলো সংরক্ষণ করেছেন সত্যি অনেক কিছু শেখার আছে সাহেবদের কাছ থেকে।

এরপরে গেলাম চিড়িয়াখানায়। বুড়ো বয়সে চিড়িয়াখানা দর্শন একটু মজার ব্যাপার কিন্তু অ্যাডিলেড জু অত্যন্ত নামকরা। পুরোটা দেখতে সারাদিন লাগে। লোকে মেলবোর্ন থেকে ড্রাইভ করেও যান দেখেছি তাই আমরাও সুযোগ পেয়ে গেলাম।

বেশ বড় কর্ম যজ্ঞ। কড়া রোদ ছিলো। ঠান্ডা পানীয় খেয়ে হন্টন দিলাম। নানান আজব জন্তুর দেখা পেলাম। যেমন এমু, কোয়ালা, Wombat, Echidna, Platypus, Galah, Kangaroo, Pandas,Wallaby and Kookaburra-

("An Aboriginal legend tells us that Agoodenout, the keeper of the sun's fire, sent the kookaburra to awaken man and all the bushland creatures to the glories of a new day. For centuries between the origin of this legend and the present, Australians have been listening to the laughter of the kookaburra and still have not found a better explanation for it" ……Internet information)

জানা গেলো কোয়ালা সারাদিন ঘুমিয়ে কাটায়। মাঝে মাঝে উঠে ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা খেয়ে আবার শুয়ে পড়ে। বিভিন্ন রঙীন পাখি দেখলাম। ছবি তুলে এনেছি। চিড়িয়াখানায় হল এক মজা। প্যান্ডা দেখার জন্য একটি কৃত্রিম জঙ্গলে প্রবেশ করতে হয়। লম্বা লাইন দিয়ে ঢুকবো।

প্যান্ডা মহাশয় গা এলিয়ে এমন দিকে বসে আছেন যেখানে পৌঁছাতে গেলে সহস্র মানুষকে ঠেলে ঢুকতে হবে। লাইন বাই লাইন এগোচ্ছেন মানুষ। আমরা মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে। প্রচন্ড রোদের তাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত। হঠাৎ-ই খামখেয়ালি প্যান্ডা ঐদিক থেকে গাত্রোথান করে আমাদের দিকে এসে বসলো। ব্যস। লোকের হুড়ো হুড়ি ! আর পেছনে থাকা আমরা একদম প্রথম সারিতে। ইচ্ছে ছিলো সমুদ্রের দিকে যাবার, সময়াভাবে হয়ে ওঠেনি। দেখবার আরো অনেক কিছু আছে। ক্যাঙ্গারু আইল্যান্ড অনতিদূরে। আছে Fleurieu Peninsula & Limestone Coast ------ পরেরদিন গেলাম জার্মান ওয়াইনারি দেখতে। নাম ব্যারোসা ভ্যালি। অ্যাডিলেড মূলত জার্মান মানুষের বসতি। তাই সমস্ত কিছু জার্মানির আদলে গড়া। জার্মান কোম্পানিতে বহুদিন কাজ করা ও অনেকবার জার্মানি ঘুরে আসা স্বামী বললেন : মনে হচ্ছে জার্মানির এক শহরেই দাঁড়িয়ে আছি। ব্যারোসা ভ্যালিতে গিয়ে ওয়াইনের নানান স্বাদ নিলাম। আমার পোর্ট ওয়াইন ও রোজ ওয়াইন বেশি ভালোলাগে। আত্মীয় বন্ধুদের জন্য কিছু ওয়াইন কিনলাম। ওখানে ওয়াইন তৈরি হয়। বড় বড় ব্যারেল রাখা। আঙুর ক্ষেত ও নুয়ে পড়া গাছ দেখলাম। অনেকটা পথ পাহাড়ি। পথে দেখা গেলো বেশ কিছু কোয়ালা গাছের ওপরে বসে ঘুমাচ্ছে। ট্রিপের শেষে হ্যান্ডর্ফ শহরে গিয়ে বিখ্যাত জার্মান সসেজ খেলাম ও কিনলাম। অপূর্ব শহর এই হ্যান্ডর্ফ। পরে এসে থাকার ইচ্ছে আছে। বেশ কিছু ভারতীয় দোকান দেখে লেহেঙ্গা চোলি ও কপালের টিপ কিনলাম। যখন কমবয়স ছিলো আমাকে দেখতে ছিলো অনেকটা নন্দিতা দাসের মতন। এখন মাথার চুল ছেঁটে ফেলায় মানে পুরো শেভ করে ফেলায় কেমন যোগিনী যোগিনী দেখায়। লেহেঙ্গা চোলি তেমন মানায় না। তবুও প্রিয় ক্রিমসন রেড এর পোষাক দেখে লোভ সামলাতে পারিনি। এখানে খুব সম্ভবতঃ মিউজিয়াম আছে। দুর থেকে দেখলাম। ভেতরে যাইনি। আন্তর্জাল জানাচ্ছে :

Hahndorf is supposed to be the oldest German settlement in Australia. It was founded in 1839 by Lutheran from Prussia and was named after Dirk Hahn, captain of the vessel that brought them over.Hahndorf certainly is a charming little village,

where you can taste some German food & beer. The little museum with displays of the village's history is also worth a visit-----

লোকাল মানুষের ঘরে তৈরি আইসক্রিম ও বিয়ার আলাদা আকর্ষণ । দুপুরে ব্যারোসা ভ্যালিতে একটি কাঠের গুম্ফা মতন ঘরে আদতে রেস্তোরাঁ খেলাম সুস্বাদু খানা । মুর্গির রোস্ট ও আইসক্রীম আমার জন্য । অন্যরা অন্যান্য জিনিস অর্ডার করছিলেন । আমাদের সঙ্গী এক জাপানী কাপেল । খুবই মিশুকে । ওঁদের সঙ্গে বিশেষ চা ভাগ করে খেলাম । ছেলেটি রেস্তোরাঁ চালান । বললেন : এই জায়গায় ওয়াইন ভালো তবে সুপার্ব নয় । স্বাদ ভালো তবে মিহিন নয় । আমি একবারে অনেকটা ওয়াইন খাওয়াতে বেশ নেশা হয়ে গেলো । ভুলভাল বকার আগেই কিছুটা যেন পালিয়ে চলে এলাম নিজেদের বাসে । রেস্তোরাঁটি রহস্যময় । ঢুকলে এমনিই একটা মাদকতা জাগে, বুনো ভাব আসে । হ্যাঁ জোর কণ্ঠে ঘোষণা করছি : দেখবার মতন শহর বটে অ্যাডিলেড । আমার খুবই ভালোলেগেছে । সম্প্রতি পড়লাম অস্ট্রেলিয়ার সবথেকে বাসযোগ্য শহর এই অ্যাডলেড । ইচ্ছে আছে এর পরের বাড়িটা অ্যাডলেডেই কিনবো । শুনলে অবাক হবেন আমার বয়স ৪৫ বছরে মেলবোর্নের বাড়ি আমাদের সপ্তম বাড়ি । অষ্টম অ্যাডলেড । ওহ ! অ্যাডলেড ----- "Kudos"! এত রূপ তোমার ! রূপসী শহর ----তুমি নারী নাকি পুরুষ ? রূপের ছটায় জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি । অপরাধ মার্জনা কোরো, নিজগুণে ।ফেরার সময় ঘোর রাত । বাসে অবশ্য উঠলাম বিকেল বিকেল মানে রাত ১০টা । এখানে সামার তাই সূর্য ডোবে অনেক পরে । পৌছলাম পরেরদিন সকালে মেলবোর্নে । ঘরে ঢুকেই প্রতিবারের মতন মন খারাপ হয়ে গেলো : আমি যাযাবরের ।*পরিযায়ী পাখি আমি ঘর খুঁজিনা, ঘর তবুও আমাকে বাঁধতে চায়- তার চারদেওয়ালের বাহুডোরে ।শেম শেম ঘর শেম শেম । নাবিককে বারণ করো নোঙর খুলতে ????*

রাজপ্রাসাদের ছায়ায় আলোয়

ক্যাসেলমেইন শব্দের অশুদ্ধ অনুবাদ হতে পারে রাজ(মেইন) প্রাসাদ(ক্যাসেল) । আমার বাড়ি থেকে প্রায় ১২৫ কিলোমিটার দূরে আছে ক্যাসেল মেইন খনি শহর । অস্ট্রেলিয়ায় গোল্ড রাশ হবার সময় যে কটি জায়গায় স্বর্ণ খনি আবিষ্কৃত হয়েছিলো ক্যাসেল মেইন তার মধ্যে একটি । আমি সপ্তাহে একদিন দূরে বেড়াতে যাই । এবারের গন্তব্য এই রাজপ্রাসাদ ।

মাউন্ট ম্যাসেডন নামক একটি অত্যন্ত সবুজ ও দীর্ঘ পাহাড় পেরিয়ে (পদতল ধরে) গেলাম ক্যাসেল মেইনে । জি পি এস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) সঠিক পথেই নিয়ে গেলো । আমার এক আত্মীয়কে অবশ্যই একটি জঙ্গলে তুলে দিয়েছিলো । সে যথেষ্ট জোরে চালাচ্ছিলো হঠাৎ দেখে সামনে একটি সজারু রাস্তা পার হচ্ছে শামুকের গতিতে । বেচারি অপেক্ষা করতে লাগলো । আমাদের সেরকম কিছু হয়নি । পাহাড়ি শহরে ঢোকার মুখে পাতাঝরা ম্যাপেল সারি থাকলেও পথের দুধারে দেখেছিলাম রং চটে যাওয়া গাছ ও বন । কেউ যেন গাছের সমস্ত রং চুরি করে নিয়েছে । সামারে এখানে প্রকৃতি খুব সুন্দর হয় । বসন্ত তো আছেই । হেমন্তে ঝরাপাতার দিন আসে তাই রুক্ষ্ম ধরাতল । পাথুরে মাটি ও রং হীন সবুজ ।

আমরা মূলত দেখলাম একটি আর্ট গ্যালারি ও মিউজিয়াম । এবং একটি হেরিটেজ হাউজ । নাম বুডা । বুঢ়া হলেও দেখতে নবীন ।

আর্ট গ্যালারিতে অনেক ছবি । কিছু শিল্পীদের উপহার দেওয়া বাকিগুলো কেনা । সমস্ত ছবি নিজগুণে ভাস্বর । গ্যালারির তিনটে ঘরে । মাঝখানের ঘরে উজ্জ্বল সব ছবি । ব্রাইট রঙ, ছাদ থেকে চুইয়ে পড়ছে সূর্য তাতে আরো উজ্জ্বল লাগছে ।

বিভিন্ন ধরণের ছবি । জলরং, তেলরং, *acrylic, ভাস্কর্য, লিথোগ্রাফ সবকিছু দেখার মতন । আন্তর্জাল জানাচ্ছে :* Most people could not afford to own an original piece of artwork by

Picasso or Van Gogh, but having a copy of their masterworks wouldn't be such a bad idea. This is where the idea of a lithograph comes into play. A lithograph is an authorized copy of an original work created by the artist himself or other skilled craftsmen.

মাঝের ঘরটাই আমার সবথেকে ভালোলেগেছে, বিমূর্ত চিত্রও ওখানেই আছে। কতগুলো ভাবনাকে রং ও রেখায় ধরা সহজ নয়। অথচ অঙ্কন এমন হতে হবে যাতে শিল্পীকে কাঁচা হাতের শিল্পী না মনে হয় অর্থাৎ শিশুর আঁকা চিত্র বলে কেউ ভুল না করেন।

দৃষ্টিনন্দন এই ঘরের ছবিগুলি মূহুর্তে মন ভালো করে দিলো নিয়মিত ইঞ্জেকশান নেওয়া আমার। ইঞ্জেকশানকে আমি খুব ভয় পেতাম। এখন ডায়বেটিসের জন্য রোজ দুটো করে নিতে হয়। হবে, যতদিন বাঁচবো। ডাক্তারদের এড়িয়ে চলতাম। এখন সেটা সম্ভব নয়। আমি না চাইলেও আশেপাশের মানুষ চান আমি বেঁচে থাকি। এই উজ্জ্বল ছবি আমার ইঞ্জেকশান নেবার সব যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিলো। বেসমেন্টে আছে মিউজিয়াম, যাদুঘর। বহু পুরনো জিনিসপত্র ও পশুর দেহ সংরক্ষিত আছে যেমন থাকে। খনি এলাকা থেকে পাওয়া নানান সামগ্রীও দেখা গেলো। দেখা গেলো বিভিন্ন পানপাত্র ও পোর্সিলিনের বস্তু। প্রতিটি আলাদা করে দেখতে হয়। বৃটিশ যুগে অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ায় বৃটিশ শাসন কালে এত্তো সুন্দর সুন্দর চায়ের কাপ প্লেট ব্যবহার করা হত তা এখনও বাংলায় পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে। মিউজিয়াম কত্রী খুবই মিশুকে। বেশ বয়স্ক। সোনালি চুলে হিল্লোল তুলে বললেন : আবার এসো, সামনেই স্কটিশ শিল্পীদের কাজ দেখা যাবে।

– ধন্যবাদ (এখানে ধন্যবাদ টা বেশি চলে, ওভারইউজড্ --না বললে মানুষ ক্ষুণ্ন হন) জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। একটি টি হাউজে বসে চা ও অপূর্ব প্যাশন ফ্রুটের গরমা গরম আইসক্রিম সহ কেক খেয়ে গেলাম বুডা হাউজ দেখতে। কিছুটা ড্রাইভ করে যেতে হল গ্যালারি থেকে। শতাব্দী প্রাচীন বুডা হাউজের মালিক এক সাহেব। ইনি ছিলেন ভাস্কর ও স্বর্ণকার।

এঁর সৃষ্ট জুয়েল্‌রি ডিজাইন লাইন, অস্ট্রেলিয়ার লিডিং জুয়েল্‌রি ডিজাইনের মধ্যে পড়ে যা ভীষণভাবেই অস্ট্রেলিয়ান । ওঁনার বাড়িটি সংরক্ষণ করা হয়েছে । ১০ ডলার করে টিকিট ।

বেশ কয়েকটি ঘর । সুন্দর করে সাজানো ওঁর আসবাসপত্র দিয়ে ।

এই দরদী শিল্পীর সৃষ্ট একটি অদ্ভুত ভাস্কর্য দেখা গেলো । এমু পাখির বৃহদাকার ডিমের নিচে রূপার কারুকার্য করে অপরূপ একটি চেহারা দিয়েছেন ।

এছাড়া ওঁনার আঁকা ছবি, তৈরি মূর্তি, ব্যবহৃত জিনিস দেখা গেলো । পুরনো পিয়ানো, রকিং চেয়ার, সাটিনের বিছানা পত্র, ঝালর দেওয়া আয়না ও চৈনিক দাবার ছক দেখা গেলো । দাবার একটি দল সাদা অন্যটি টকটকে লাল ।

আজব দাবা, নয় কি ? চীনা শ্রমিক এসেছিলেন সুদূর চীন থেকে সোনার সন্ধানে । ওঁদের দেশে সম্রাটের অত্যাচারে সবাই কাহিল । মূলত চাইতেন কিছু সোনা নিয়ে ফিরে যাবেন । কিন্তু অনেকেই মুগ্ধ হয়ে থেকে যান ক্যাসেল মেইন-এ । এইসমস্ত মানুষ খুবই ইম্প্রেস করেন শিল্পীকে । তাঁর বহু শিল্প কর্ম এঁদের ঘিরে তৈরি হয়েছে।

পুরো বাড়িটি আমি দেখলাম খালিপায়ে আমার সঙ্গী জুতোর ওপরে সমুদ্রনীল প্লাস্টিক জড়িয়ে কারণ এটাই ওখানে রীতি । আমার নেলপালিশ বিহিন সরু পায়ের পাতা দেখে সংরক্ষক বললেন : নেভর সিন আ পার্সন লাইক ইউ উইথ সাচ আ থিন ফুট !!

হাসলাম । তাহলে আমার পদপল্লবের ভাস্কর্য হবে এবার ! বুডা হাউজ এক মনোরম পাহাড়ের ওপরে । চারপাশে হলুদ ও মেরুন গাছপালা । উঁচু নিচু পথ । সোনালি মানুষ । মনে হল রাজপ্রাসাদের ছায়াতে আলোতে বিদায় বেলায় জোর গলায় গেয়ে উঠি:

বুডা তুমি বৃদ্ধ হওনি বৃদ্ধা ধরিত্রীর মতন ! তাই তুমি বুডা, বুঢ়া নও !

শুধু একটিমাত্র আক্ষেপ রয়ে গেলো বুডাকে ঘিরে। এত প্রাচীন বাড়ি অথচ প্রেতাত্মা নেই ? :(

এ কেমন হে ? চিন্তাটি ওঁদের কমেন্ট পত্রে লিপিবদ্ধ করে এসেছি যথারীতি !!

ক্যাসেলমেইনে রাজপ্রাসাদ না দেখা গেলেও অন্য যা কিছু দেখলাম, মন মাতালো।

মাউন্ট ম্যাসেডন পার হয়ে তো গেলাম। আমার এক বিদেশী আত্মীয় এখানে আগে থাকতেন এখন বাড়ি বেচে চলে গেছেন অন্যত্র। উনি আমাকে বলেছিলেন এখানে বেড়াতে যেতে। যাওয়া হয়নি। জানা গেলো ভারি সুন্দর এখানে প্রকৃতি। তাজা বাতাস ও বুনোফুলের মিষ্টি সুবাস মনকে করে পাগলপারা। এখন তো উইকিপিডিয়া আছে কাজেই চিন্তা কি ?

খুলতেই জানা গেলো :

The 2009 Nicolas Cage film 'Knowing' was filmed in locations in the township along with nearby Macedon and the future release 'Don't be Afraid of the Dark' was also filmed in the town over the 2009 winter.

Scenes in "Where the Wild Things Are" were filmed in the forest surrounding Mount Macedon``

AND

---- Buda, built in 1861, is a National Trust registered historically significant house museum and garden, situated in the north central Victorian town of Castlemaine. Buda was the home of Hungarian gold and silversmith, Ernest Levy, his wife Bertha, and their ten children; four sons and six daughters.

Levy's five unmarried daughters Hilda, Beatrice, Gertrude, Bertha and Mary lived their entire lives at

Buda. Only two generations of the Levy family occupied Buda for 118 years from 1863 to 1981. Hilda, the last surviving sibling passed away in 1981 at ninety-six years of age. She bequeathed the house and its entire contents to the Trustees of the Castlemaine Art Gallery & Historical Museum, to be open to the public as a House Museum and Garden.

তাহুনে রোদবৃষ্টিতে

ভ্রমণ পিয়াসী আমার ইস্টারের গন্তব্য হংসমিথুন খচিত নীলাঞ্জন টাসমানিয়া । সবুজ দ্বীপ, ছোট্ট দ্বীপ । অস্ট্রেলিয়ার নিচের দিকটায় এই দ্বীপ, অনেকটা শ্রীলঙ্কার মতন । ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি ও খেয়ালি রোদ এই নিয়েই আমার দেখা টাসমানিয়া । ভ্রমণের চতুর্থ দিন থেকেই শুরু করছি । শেষদিনে গেলাম বিখ্যাত তাহুন জঙ্গলে । এখানে অ্যাব অরিজিন মানুষ বসবাস করতেন । তাঁদের ভাষায় তাহুনের অর্থ হল

“peaceful place by running water”. (Huon River). ...

হোবার্টের (টাসমানিয়ার রাজধানী) দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এক ঘন্টা গেলেই এই সবুজ জঙ্গল । -অরণ্যের হাতছানিতে আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে গেলাম । ঘুম ওড়না সরিয়ে দিলো তাহুনের ডাক । বেশ ঠান্ডা । হাড় কাঁপানো । টাসমানিয়ার যেই অংশে আমরা ছিলাম তা আদতে পাহাড় । হয়ত তাই । ভলবো বাস প্রথমে নিয়ে গেলো ফরেস্ট মিউজিয়ামে Forest and Heritage Centre, Geeveston—

ফ্লাস্কের চা খেয়ে ঘুরে দেখা হল । পুরোটা খুব সুন্দর । কাঠের চোখজুড়ানো সব ভাস্কর্য । ছোট ট্রেন । লরি । বড় কাঠের লরি । শিকারির মূর্তি । নানান মেশিন । সমস্ত প্রিসার্ভ করা রয়েছে । জানা গেলো অরণ্য সম্পর্কে নানান কিছু । কিছুটা আমি আগেই জানতাম পাঠ্য পুস্তকের কল্যাণে, বাকিটা জানলাম । অ্যান্টিক, অপরূপ কাঠের সাজসজ্জা দেখে মন জুড়িয়ে গেলো । পুরো বিল্ডিং-টায় একটা বুনো গন্ধ । নিঝুম অরণ্য । কাঠের গুড়ি । পাখির কাকলি । মনে পড়িয়ে দেয় হিমালয়ের কথা ।

এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে তাহুনে এয়ার ওয়াক । ঘন জঙ্গলের মধ্যে ইউক্যালিপটাস গাছ ও নদীর ওপর দিয়ে যেন উড়ে যাচ্ছে মানুষ এই এয়ার ওয়াকে চড়ে । আসলে একটি লম্বা সরু ভয়ানক ব্রিজ । শক্ত পোক্ত কিন্তু চড়লে ভয় লাগে । আমার আবার শত ব্যাধির মধ্যে নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘোরে ব্যাধিটি আছে কাজেই ব্রিজে চড়ে ভীষণ ভয় পেলাম ।

যদিও নিচের দিকে তাকাই নি তবুও চারপাশের দৃশ্য তো বাধন হারা সুখের সন্ধান দেয়। একজন ছোট কম্পিউটার নিয়ে ঘুরছেন। উনি গুগুলে দেখে বোধহয় বললেন :

Main attraction is the cantilever perched above the forest - walk 40m high amongst the treetops and amazing views across the Southern Tasmanian forests and World Heritage Area---

আমি কিন্তু ঐ ক্যান্টিলিভার দিকটায় যাইনি।

মূল ফটক থেকে তিনটি রাস্তা ধরে তিন দিকে যাওয়া যায়। তার একটি এই এয়ার ওয়াক। এছাড়া ঝুলন্ত ব্রিজ আছে যা অত্যন্ত ভয়াবহ বলে আমরা গেলাম না অন্যটি একটি ছোট ওয়াক নাম হুয়ন পাইন ওয়াক। ঐ পথে, বনপথের মধুগন্ধ নিতে নিতে ঘোরা হল বেশ কিছুটা পথ। আমি ও আমার সঙ্গী। কিছু হনিমুন কাপেলকেও দেখা গেলো। রাত জেগে টিভিতে সিনেমা দেখে এসেছেন। একজন আরেকজনের ঘাড়ে ঢুলে পড়ছেন। ইচ্ছে করছিলো ওখানেই থেকে যাই কিন্তু নাহ্ ফিরতে হবে গোঠে। বনপথে, সবুজ সবুজ উপহার, পাইনের গন্ধ, পাগলাঝোরা, নুড়ি পাথর ---- শুধু জংলী জানোয়র নেই।

ঝুলন্ত ব্রিজের ওপরে পা দিলেই ব্যাকগ্রাউন্ডে বলহরি হরিবোল শুনতে পাবো আঁচ করে না গেলেও কয়েকজন বাসসাথী জানালেন যে ঐদিকটাও অপুর্ব। আমরা কিছু একটা মিস করে গেলাম। প্রায় ৬০০ মিটার লম্বা এই ব্রিজ থেকে কাকচক্ষু সরোবর দেখা যায়। ভেজা ভেজা ইউক্যালিপটাস বন যাকে দক্ষিণ ভারতে বলে নীলগিরি বন এই ব্রিজের অলঙ্কার।

ঠান্ডায় আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার অবস্থা! তাড়াতাড়ি নেমে এসে খেয়ে নিলাম রেস্তোরাঁতে। খাবারের অর্ডার আগেই দেওয়া ছিলো, তা আমাদের প্যাকেজের মধ্যেই। সাধারণ স্যান্ডউইচ ও কেক এবং এই শীতলতায় আর্ল গ্রের সুস্বাদু চা। জমে গেলো।

আমি বনমাতাল । বন আমার অন্য ভুবন । ব্যাঙ্গালোরে আমি জঙ্গলের কাছেই থাকতাম ইচ্ছাকৃতভাবেই । শহরে বাড়ি না কিনতে পেরে নয় ।

জঙ্গলে সবাইকে ডাকে না । এও এক তীর্থস্থান । এখানে আসতে হলে হতে হয় সাচ্চা অরণ্য প্রেমী – দিল সে রে ! সমস্ত মুখোশ খুলে আসতে হয় ।

পুরো দিনটা খুব উপভোগ করলাম । ফিরলাম ক্রুজ করে । সাদা জাহাজে চড়ে একেবারে ডেকের সামনে দাঁড়িয়ে শীতল বাতাসে মনে রং লাগে । জাহাজ চলেছে ডলফিনের সাথে পাল্লা দিয়ে । লক্ষ লক্ষ ডলফিন । ওশিয়ানের কাছে মোহনায় যাবার সময় দেখলাম এক দ্বীপ । ফ্রেঞ্চ কলোনি । ডেকের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে নাবিক মনে হচ্ছিলো । নোঙর খোলা নাবিক । আদতে মনে মনে আমি যা । নিজেকে মেলে ধরলাম মহাকালের ময়দানে ।

ফেরার সময় বাস ড্রাইভার বললেন : লেখা ছেড়োনা । ভালো লেখকদের একদিন না একদিন সমাজ ডাক দেবেই । তুমি লিখে যাও ।

মুগ্ধ হলাম ওঁর সংবেদনশীলতায় ।

একটি ব্রিজ, টাসমান ব্রিজ পেরিয়ে হোবার্ট শহরে আমাদের হোটেলে আসতে হয় । পশ্চিম থেকে পূর্বে যেতে গেলে পেরোতে হয় এই ব্রিজ যা শহরের মূল রাস্তা । ৫টি লেন আছে ।

হোবার্ট বিমান বন্দর থেকেও এই পথেই ঢুকতে হয় । জানা গেলো বহুদিন আগে ব্রিজটি জাহাজের ধাক্কায় ভেঙে পরে । ওপরে চলমান সমস্ত যান ও মানুষ নিচে পড়ে যান ।

জাহাজের মানুষেরাও আহত ও মৃত । যাঁরা ব্রিজ পেরিয়ে কাজে এসেছিলেন তাঁরা বাড়ি ফেরেন ফেরিঘাটে গিয়ে ফেরি ধরে ।

The Tasman Bridge disaster occurred on the evening of 5 January 1975, in Hobart, the capital city of Australia's island state of Tasmania, when a bulk ore carrier travelling up the Derwent River collided

with several pylons of the Tasman Bridge, causing a large section of the bridge deck to collapse onto the ship and into the river below. Twelve people were killed, including seven crew on board the ship, and the five occupants of four cars which fell 45 m (150 feet) after driving off the bridge. The disaster severed the main link between Hobart and its eastern suburbs, and is notable for the social impacts that resulted from the loss of such an important road artery.:: WIKIPEDIA

পরেরদিন ভোরের ফ্লাইটে ফিরবো মেলবোর্নে ।

কাজেই সারাদিনের ক্লান্তি কাটাতে –হোটেলে ফিরে গরম জলে স্নান করে নিলাম । নিচে যেতে হবে ডিনার খেতে । এই হোটেল এক আসামীর তৈরি । অস্ট্রেলিয়ায় নির্বাসিত এই আসামী দন্ড শেষে হোটেল খুলে বসেন । তার আগে কারাগারের চিফের কিচেনে রান্না করে শেফ হন । বহু পুরনো এই হোটেলে ইতিহাসের সুবাস । নিজেকে কনভিক্ট হিস্ট্রির অংশ বলে মনে হচ্ছিলো । এমনিতে আমার ক্রিমিন্যালদের প্রতি একটি অন্য দৃষ্টি ভঙ্গী আছে । আমি মনে করি ওদের সুযোগ দেওয়া উচিৎ মেনস্ট্রিমে ফিরে আসার । খারাপলোকের খারাপ দেখার মধ্যে কোনো বীরত্ব নেই । পাঁক থেকে পদ্ম তোলা– মহৎ কর্ম বলে মনে হয় । তাই রোমাঞ্চ হচ্ছিলো একজন আসামীর তৈরি হোটেলে থাকতে ও খেতে পেয়ে। ১৮৩৪ সনে তৈরি এই হোটেলের রেস্তোরাঁর নাম ১৮৩৪ । পুরোনো গন্ধ, হালকা হাসি ও গাঢ় অবছায়া মাখা এই পান্থনিবাস একেবারে শহরের কেন্দ্রে । কত কথা, গান, হাসি ভেসে বেড়ায় বাতাসে । রোস্ট খেলাম । হাঁসের রোস্ট ও কাস্টার্ড । ফায়ার প্লেসের পাশে বসে । তখনই আগের তিনদিন ঘুরে বেড়ানোর স্মৃতি শেঁকে নিচ্ছিলাম মনের গনগনে চুলহায় ।

প্রথম দিন ট্যুর বাতিল হয়ে গিয়েছিলো । ছিলো বিখ্যাত পোর্ট আর্থার ট্যুর ।অস্ট্রেলিয়ার কনভিক্ট ইতিহাসে সে এক করুণ কাহিনি । পমি (প্রিজনার অফ মাদার ইংল্যান্ড) বন্দীদের মধ্যে যারা আরো দুরাত্মা তাদের পাঠানো হত পোর্ট আর্থারে । লেফটেন্যান্ট জর্জ আর্থারের নামে নামকরণ করা হয়

এই দ্বীপের। এখানে ছিল বিচারাধীন বন্দী আবার কেউ বা দাগী আসামী। ১৮৩৩ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত এই স্থান ছিলো হার্ডকোর বৃটিশ ও আইরিশ ক্রিমিন্যালের চারণভূমি। কালাপানি পার। কারাগারে আলোর পিয়াসী।

কিছু দালানের ধ্বংসাবশেষ, পাথুরে সোপান, লৌহকপাট, খন্ডহর। কানাগলিতে আঁধারের চিমটে দিয়ে তুলে নেয় পাপিষ্ঠের আত্মা, খোদ যমরাজ। স্যাঁতস্যাঁতে, ভেজা ভেজা কালকুঠুরিতে এককোটা আলোর দিশারি লুপ্তপ্রায় মধ্যযুগীয় হ্যারিকেন। ভৌতিক লন্ঠন।

নিজেকে পোর্ট আর্থারের অঙ্গ মনে হয়। মনে হয় এখানে যে সমস্ত সিভিলিয়ান ছিলেন কর্মসুত্রে আমিও বোধহয় কোনো এক জন্মে তাঁদেরই কেউ ছিলাম। পোর্ট আর্থার ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি নয় জীবন্ত স্বরলিপি। অকথিত উপাখ্যান। আমার কাছে। আরেকটি প্রাক্তন বৃটিশ কলোনির কালোমেমের কাছে।

ছমছম - ছমছম - ছমছম ----- সত্যজিতের তিনকন্যার মণিহারা নয় এ যেন জিঘাংসা সিনেমার সেই রেলের খালাসী, ভৌতিক পায়ে, কায়াহীন অবয়বে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে আমার দিকে :

ফ্যাসফ্যাসে গলায়, আমার মুখে স্খলিত, ভ্রষ্ট একখানি লন্ঠন ধরে বলছে : পোর্ট---আর্-থার্ --------মিসেস ব্যাট্টাচারিয়া --- পোর্ট-আর্-থার !

তার বায়বীয় দেহ বেয়ে পড়ছে শুকনো রক্ত। চোখের কোলে কালি, অত্যাচারের সাক্ষী।

ওষ্ঠে গলিত লাভা !

কিশোর অপরাধী, বিনা দোষে অথবা বিনা বিচারে এখানে স্থান পাওয়া নানান মানুষ রক্ত দিয়ে লিখে গেছেন তাদের প্রিয়জনদের কথা। ওপেন এয়ার মিউজিয়াম রয়েছে। আমরা যেতে পারলাম না বলে দু:খ হচ্ছিলো। আলাপ হল ব্রেকফাস্টের সময় ব্যাঙ্গালোরের বিদ্যা ও রবির সঙ্গে। দেখা হয়েছিলো লিফটে। শুভেচ্ছা বিনিময় ব্যাতীত কিছু হয়নি। খাবার টেবিলে

অনেক গল্প হল । আমার মধ্যে এখনো ব্যাঙ্গালোর একটু বেশি বেশি, বিদেশ ও কলকাতা কম কম তাই খুব আনন্দ পেলাম দেশওয়ালাদের পেয়ে । প্রিয় রেস্তোরাঁ, প্রিয় হ্যাঙ-আউট, নন্দী পাহাড়ের ঝর্ণা ও ট্রেকিং এর কথা, দক্ষিণী পোঙ্গাল ও বিসিবেলি বাতের কথা, নারকেল চাটনির কথা বল ও শুনে শুনেও আমি পরিশ্রান্ত নই । খাওয়া শেষে ওরাই প্রস্তাব দিলো : আমরা ক্যাব ভাড়া করেছি, পোর্ট অর্থারে যাচ্ছি । হোয়াই ডোন্ট ইউ জয়েন আস ?

কর্তা ও আমি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম, একেই বলে মেঘ না চাইতেই জল !

আমি তো এক পায়ে খাড়া । কারণ এখানে না গেলে সারাটা দিন মিউজিয়াম ঘুরে কাটাতে হত।

অতএব । যথাসময়ে রওনা দিলাম । লম্বা সফর । অপূর্ব পথঘাট । বর্ণনাতীত । সবুজ ভেলভেটের চাদর বিছিয়ে প্রকৃতি ডাকছে, আয় রে ছুটে আমাকে নিবি না লুটে ?

কিছু কিছু জায়গায় নেমে হেঁটে ঘুরলাম । যেমন বনরং ন্যাশনাল পার্ক । বিভিন্ন পশুরা দিবানিদ্রা দিচ্ছে যেমন ক্যাঙ্গারু, কোয়ালা ও নানান কিছু । তাদের দর্শন দিলাম । বিভিন্ন জাতের বাঁদর ও পাখি দেখলাম । রবিরা পশুদের খাওয়ালো । আমরা কফির কাপ নিয়ে পুরোটা ঘুরে দেখলাম । পাহাড়ের ঢালে এই মুক্ত চিড়িয়াখানা । যতদূর চোখ যায় শুধু পাহাড় ও সবুজাভা । পশুর সঙ্গে হাসিখেলায় মেতেছে ওর রক্ষক এক মেমসাহেব । বলেন : ওরা আমাকে খুব ভালোবাসে ☺

বেরিয়ে লাঞ্চ খেলাম সাবওয়েতে । বিদ্যা বললো : আমার পাউরুটি খেতে খুব ভালোলাগে । দিনের যেকোনো সময় আমি পাউরুটি খেতে পারি । কাজেই সাবওয়েতে ঢুকে ওর খুব ভালোলেগেছে ।

আমার ঠিক উল্টো । আমি পাউরুটি খেতে একদম ভালোবাসি না । বিশেষ করে লাঞ্চে ।

তবুও সেদিন বাধ্য হয়েই খেলাম।

গল্প করতে করতে জানা গেলো : ফিলিপিন্সের মানুষ আমাদের নাগা-কুকিদের মতন কুকুর খায়। তারা সব খাবারের গন্ধ শুঁকে খায় একজন মজা করে বললেন : অর্থাৎ নিজেরাও---☺। রবির এক বন্ধু মার্চেন্ট নেভিতে ছিলেন। উনি দেখেছেন যে ডকে গেলেই ফিলিপিনো জাহাজ খালাসীরা, পোষা কুকুরকে মেরে খেয়ে ফেলে।

আমাদের এক তাইওয়ানি বন্ধু বলছিলেন যে চীনারা আকাশের দিকে পিঠ করে যেসব জীব থাকে, সবাইকে খায়। ভাগ্যিস মানুষ তেমন নয়! কুব্জ-কুব্জারা বাদ যাবেন কি? চীনা দোষ থেকে? ভাগ্যিস আমি কুব্জো নই! থ্যাঙ্ক গড!

অনেকটা পথ চলতে চলতে পৌঁছে গেলাম পোর্ট আর্থার। প্রথমেই টিকিট কেটে নিলাম ছোট ক্রুজের ও বক্তৃতা শোনার। তারপর পুরো মিউজিয়াম ঘুরে দেখলাম। দেওয়ালে দেওয়ালে কত কথা, ব্যাথা ঝুলে আছে। বন্দীদের পোশাক, লোহার চেন, পায়ের বেরি, বদ্ধ এক হাত প্রকোষ্ঠ, খাবারের মেনু, হাতের কাজ কর্ম, সূচি শিল্প সমস্ত রাখা আছে। দেখা হল। দু:খ হল জেনে যে অনেক বাচ্চাকে এখানে বিনা অপরাধে কিংবা স্বল্প অপরাধে চালান করে দেওয়া হত। আমি আমার স্বামীকে বললাম : ওদের একটা সুযোগ দিতো না, শোধরাবার? সামান্য রুটি চুরি কি বিরাট অপরাধ যে সারাটা জীবন ভুগতে হবে?

এইভাবেই নানান বন্দীর অভিশাপে শাপিত পোর্ট আর্থার আজ এক রহস্যময় ভূমি।

আছে ঘোস্ট ট্যুর ও শিরদাঁড়া খাড়া করা অন্যান্য ট্যুর। গাইডের সংগে ঘুরে ঘুরে রাতের নিকষ কালো অন্ধকারে জানা যাবে লোম হর্ষক সব কাহিনী। আকাশে বাতাসে, মেঘে ঢাকা পুর্ণিমার অদেখা চাঁদের মতন কতনা বায়বীয় শরীর তাদের মায়াজাল বিছিয়ে রয়েছে এখানে। শুধু জানার ইচ্ছেটা চাই। তাহলে ধরা দেবে সেদিনের পোর্ট আর্থার ভ্রামণিকের চোখে।

আমাদের ট্যুর গাইড নানান গল্প বললেন, নানান জায়গা দেখালেন। তারপরে গেলাম ছোট ক্রুজে। ২৫ মিনিটের ক্রুজ। ভাসমান লঞ্চেই দিলো কফি ও স্ন্যাক্স। নানান গল্প শুনলাম স্থানাভাবে যা এখানে বলা সম্ভব নয়।

ফিরতি পথে দেখলাম ভাঙা, পরিত্যক্ত চার্চ। সেদিন ছিলো গুড ফ্রাইডে। মহাত্মা যিশুর বিশেষ দিনটি। চার্চ কিন্তু ফাঁকা। এই চার্চটি ভিন্ন ও নব, অনতিদূরে। ব্যবহার হয়, আজও।

শুনশান। বাইবেল নয়, কদবেলও নয় দেখলাম কিছু ধাতব বেল অর্থাৎ ঘন্টা। বিশালাকৃতি। ঝোলানো রয়েছে আগের অন্য পরিত্যক্ত গীর্জার ভেতরে। ঐতিহাসিক এই ঘন্টাগুলিও মধ্যে কয়েকটা মিসিং। কেউ জানলে যেন সন্ধান দেন। লেখা রয়েছে পাঁচিলে। স্বর্ণাক্ষরে।

সাঁঝবাতি জ্বলতেই ঘাড়ে কেউ শ্বাস ফেলে, সব আঁধার। গা ছমছমে ভাব পোর্ট আর্থারে। যেখানে এক সার্জেনকে দিয়ে পাথর ভাঙানো হত বলে শোনা গেলো। এসেছিলেন তো ডাক্তারি করতে, করতেন শ্রমিকের কাজ। এইসব বিদেহী আত্মারা কোথায়? স্পিরিট ওয়ার্ল্ডে নাকি এখানে? ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়। দৌড়ে উঠে পড়লাম গাড়িতে। আমরা চারজন। তারপর চলা ও চলা।

ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে এক সময়ে এলাম লোকালয়ে। একটি ম্যাকডোনাল্ডে বসে কফি ও অন্যান্য কিছু খেয়ে, গাড়িতে তেল ভরে গেলাম হোটেলে। আকাশে তখন ঘন কালো নিশা। পোর্ট আর্থারের গল্প এই স্বল্প পরিসরে বলা সম্ভব নয়। যাঁরা লিখতে ভালোবাসেন তাঁরা লিখে যেতে পারবেন, আমার মতন অলস লেখিকা নন। তাই বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন এখানে : http://www.portarthur.org.au/

অস্ট্রেলিয়ায় এলে একবার এখানে আসবেন সম্ভব হলে। মনে রাখার মতন অভিজ্ঞতা।

দ্বিতীয় দিন গেলাম একটি মিউজিয়াম দেখতে। নাম মোনা। মিউজিয়াম অফ ওল্ড অ্যান্ড নিউ আর্ট। সংক্ষেপে মো-না। হোবার্ট পোর্ট থেকে নৌকো

করে নিয়ে গেলো একটি সবুজ দ্বীপে। সেখানেই এই মিউজিয়াম। চারপাশে ভয়ংকর সুন্দর মায়াবী পাহাড়। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠি। সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ারের সবথেকে বড় প্রাইভেট মিউজিয়াম এটি। এরকম আজব মিউজিয়াম জীবনে দেখিনি। একে মিউজিয়াম না বলে কামকলার ক্ষেত্র বলা যায়। গাইডের মতে : আই ওপেনার।

আমার কিন্তু আই চিরতরে বন্ধ হয়ে গেলো। মনে হল এই মিউজিয়ামের মালিক অসুস্থ না হয়ে যায় না! সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের পক্ষে এ বানানো বড় কঠিন।

বেশির ভাগই বিকৃত কলা। এ ওকে মারছে, গলা টিপছে, যৌনাঙ্গ টিপছে, স্তন মালিশ করছে, রক্তাক্ত মানুষকে গিলে খাচ্ছে অন্যানরা এইসব। একটি শো চলছিলো। সেখানেও একই জিনিস দেখা যাচ্ছে। এ ওকে রেপ করছে এ ওর স্তনে মালিশ করছে। কিম্ভুত কিমাকার ব্যাপার। আমি তো স্লাম ডগ অত বুঝিনা। আমার তাই মন্দ লেগেছে। আমি বুঝতে পারিনি। আমার লিমিটেশান পাঠক মার্জনা করবেন!

কেন ভারতীয় তোমাদেরও তো আছে, কোনারক, খাজুরাহো? মৈথুন - কামকলার নিদর্শন! তারওপর কামাসুট্রা! কুকুর পোজ বেড়াল পোজ এখানেও দেখলাম। একটি লোক কুকুরের সঙ্গে সেক্স করছে। একজন অস্ট্রেলিয়ান ভদ্রমহিলা বললেন : দা পার্সেন ইজ সিক!

এই মিউজিয়াম পাহাড়ের গায়ে। প্রাকৃতিক ঝর্ণা আছে। ঝর্ণা থেকে জল পড়ছে এক একটি বাক্যের আকার হয়ে। যেমন : গুড ডে। সুইট মেমরিজ। এইসব। মিঠে তানে মন জুড়ায়।

একটি জায়গায় ছাদ থেকে আলো চুইয়ে পড়ছে : দেখা যাচ্ছে রাস্তার ট্র্যাফিক, এক ব্যস্ত চৌমাথা। ত্রস্ত মানুষজন। চারদিকে গাড়ি। পুলিশ, আলো। সিগন্যাল। সমস্তটা যেন সিনেমার পর্দার মতন মেঝেতে পড়ছে। অপুর্ব।

একটি ঘরে নারীর যৌনাঙ্গের ভাস্কর্য। কার যৌনাঙ্গ কেমন তারই নিদর্শন। ধরে দেখো, ছুঁয়ে দেখো। অনুভব করে দেখো। পেছন থেকে এক সাহেবের

গলা পেলাম । সঙ্গিনীকে বলছেন : দেখি তোমায় চিনতে পারি কিনা ! বলেই একটি ক্লিটরিস ধরে নেড়ে চেড়ে দেখছেন । হ্যা হ্যা হ্যা করে হাসছেন সাদা চামড়া । আমি কালোভূত তো অক্কা, সভ্যতার নমুনা দেখে ! আমার লাগাম ছাড়া কল্পনাপ্রবণ মনের কি বিশ্বাস রে বাবা ? পাশ কাটিয়ে চলে এলাম । কেটে পড়লাম বলা ভালো ।

ইরোটিক জেসচার, ভালগার ভোকাবুলারি দর্শকদের । কেউ যদি চিত্র ও ভাস্কর্যে মানে ফিজিক্যালি এগুলিতে অংশগ্রহন করতে শুরু করেন তখনই সমস্যা শুরু হয় । শুধু অনুভব করলে কিংবা দেখলে অসুবিধে নেই ।

এখানে একটি নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিভাগে মেয়েরা তা প্রায় গোটা ১৮ -নিজেদের যৌনাঙ্গের ছবি তুলে নিজেদের পত্রিকাতে ছাপিয়ে লিখেছে যে এরকমই হয় সবার, অন্য মেয়েরা লজ্জিত হয়ো না নিজেদের নিয়ে । তোমাদের গুলি মিলিয়ে নিও এর সাথে । যদি ভিন্ন হয় তবুও স্বস্তি পেয়ো কারণ এর মধ্যে কারো না কারো সাথে মিলবেই । মুখ নেই যদিও কারো ।

এই তো হল পশ্চিম । আর আমরা প্রাচী । ইস্ট ইজ ইস্ট ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট ।

কাজেই মিউজিয়াম ! ওঁরা ওঁদের মতন আমরা আমাদের । ওঁদের কিছু ভালো, আমাদেরও।

শিল্পকে অশ্লীল বলা যাবেনা । শিল্পে কতটা স্বাধীনতা থাকা উচিৎ মনে হলে আবার ফিদা হুসেনের কথা মনে হয় । স্বরসতীকে নগ্ন না এঁকে উনি মহম্মদ হজরতের মা-কে নগ্ন এঁকে দেখুন না মজা ! চোখে সূর্মা পরা পুরো ইসলাম ওয়ার্ল্ড পেছনে লেগে যাবে -বলেছিলো আমার এক রসিক বন্ধু । আবার ভাবি --ভাগ্যিস এই মিউজিয়ামের মালিক সাদা চামড়া ! নাহলে এতখানি বোরখা সরানোর জন্য প্রচন্ড কড়া শাস্তি পেতেন ।

মোদ্দা কথা আমার মিউজিয়ামটা ভালোলাগেনি । গর্ভমেন্ট মিউজিয়াম এরে চেয়ে অনেক ভালো । যাইহোক এখানে কিছু সুস্থ ভাস্কর্যও আছে । বেশির ভাগই বিমূর্ত কলা ।

শিল্পী কি বলতে চান জানতে হলে ডাইরেক্ট কথা বলেও নেওয়া যায় মাইক্রোফোন এর মাধ্যমে। চামড়ার কাজ, প্লাস্টারের কাজ, ধাতুর কাজ কি নেই ?

সবথেকে ভালোলাগলো একেবারে টঙে উঠে জিরো ওয়ানের ঘরে ঢুকে।

মহাকাশের খেলা। মনে হল নিজ জগতে চলে এসেছি অসুস্থ একটি কালকোঠরি থেকে।

আমার এরকম তেতো লেগেছে বলেই যে অন্যের ও লাগবে তা তো নয়। জীবন আপেক্ষিক। কাজে কাজেই একবার দেখে নেওয়া যায় মিউজিয়ামটা।

তৃতীয় দিনে আমরা সবাই মিলে ঝর্ণা দেখতে গেলাম বনে। যাবার আগে দেখলাম এক মাছের ভেড়ি। অসম্ভব সুন্দর জায়গাটি। জলে রঙীন মাছ। ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ ইয়া বড়। শোনা গেলো মাঝে মাঝে ডাকবিল প্ল্যাটিপাস দেখা যায়। তবে ওরা খুবই লাজুক।

ছো- ছ্যুইট !! এই ভেড়িতে মিষ্টি মাছ - ট্রাউট এর চাষ হয়। তারপর তা চালান হয় সমুদ্রে।

ট্রাউটের ডিম নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে ও নিউজিল্যান্ডে পাঠানো হয়। এছাড়া স্যামনও পাওয়া যায়। সংলগ্ন প্যান্ট্রিতে খেলাম অসম্ভব সুস্বাদু প্যানকেক। আমাদের বাঙালদের চিতাই (চিতৈ) পিঠার মতন। শুধু গরমাগরম মাছ ভাজাটা খুব মিস করলাম। যা কিনা সুন্দরবন হলে নির্ঘাত জুটতো। ☺ মাছ খেকো আমি বাঙালী ভূত।

জোছনা দিনে সবাই গেলাম বনে। আনমনে। জল রূপায়নের এমন দৃশ্য আগে যে দেখিনি তা নয় তবে এ তো টাসমানিয়া। মানে বিদেশ। কাজেই ! ফলসের নাম রাসেল। আগে ছিলো ব্রাউনিং ফলস্, আবিষ্কারকের নামে। ঘন ইউক্যালিপটাস বনে ঝর্ণা। ট্রেকিং করে যেতে হয় অনেকটা। আমার জোঁকে ভয় ছিলো। কিন্তু শেষ মুহূর্ত অবধি একটিও দেখা গেলোনা।

গাইড কাম ড্রাইভার যিনি অশেষ জ্ঞানী উনি বললেন যে সাপখোপও পেতে পারো তবে এখন শীতকাল এসে গেছে ওরা শীতঘুম দেবে । দেখলে পাশে সরে যেও, কিছু বলবে না ।

পায়ের দড়ি মানে পেশী ছিঁড়ে পৌঁছালাম রাস্কেল রাসেলে । দৃষ্টি নন্দন অপরূপ ঝর্ণা । ফেনিল জলরাশি, সফেদ চিকন । মাউন্ট ফিল্ড ন্যাশনাল পার্কে অবস্থিত এই ঝর্ণা আদতে : 100 metres downstream of Horseshoe Falls.

অরণ্য মা । আমি তাঁর মেয়ে । আমাকে রক্ষা করেন উনি সাপখোপ, পশু ও কীট পতঙ্গের হাত থেকে । তবুও সাহস করে একটি জংলী পথে যেতে পারলাম না । ভীষণ বুনো সেটা । অতিরিক্ত ।

বন্য বন্য এই অরণ্যে দুনিয়ার সবথেকে উঁচু গাছ আছে । সোয়াম্প গাম মানে ইউক্যালিপটাস । এরচেয়ে বড় গাছ একমাত্র আছে ক্যালিফোর্নিয়ায় । রেডউড অরণ্যে । লেডি বার্‌রন ফলস্ আরো দূরে । প্রায় ২/৩ ঘন্টা । তাই স্বভাবতই যাওয়া হয়নি । যেটুকু পথ হাঁটলাম, বড় রোমান্টিক । বড় মিঠেল সেই যাত্রাপথ । কুমারী প্রকৃতিকে ধর্ষণ বিদেশে করা যায়না । পুলিশের গোলাগুলির বর্ষণে প্রাণ যাবে ধর্ষণকারীর । কাজেই এখানে ধরিত্রী অধরা । একবার ছুঁয়ে দেখতে হলে চলে আসুন সবুজ দ্বীপ টাসমানিয়ায় । আন্দামানের সঙ্গে অনেক মিল । জারোয়ার বদলে অন্য উপজাতি রয়েছে ! অস্ট্রেলিয়ার নর্দান টেরিটরিতেও প্রচুর উপজাতি আছেন । ওরাই আদতে অস্ট্রেলিয়ান । সাহেবরা অথবা আমরা তো পরে এসেছি !! ওদের আমরা ফোরফাদার বলি ।

নাহ্ সবুজ দ্বীপের রাজার সন্ধান পেলাম না । বরং পেলাম দেখা একদল দুর্ধর্ষ দামাল মানুষের, একেবারে প্রথমদিন । গভীর রাতে । বিমান বন্দরে ভীড়ের জন্য ফ্লাইট ডিলে হওয়াতে আমরা পৌঁছাই অনেক রাতে । গাড়ি নিতে এলে আরো রাতে । খেতে গেলাম হোটেলে বললো সব বন্ধ হয়ে গেছে । বিখ্যাত সালামানকা মার্কেটে একটি ভিয়েতনামি দোকানে খেলাম । দোকান বন্ধ হয়ে গেছে । বিদেশী দেখে হয়ত করুণা করে খেতে দিলো যা ছিলো ।

এদিকে এয়ারপোর্টে ডোমেস্টিক ফ্লাইট হওয়া সত্ত্বেও QUARANTINE AND INSPECTION SERVICE কুকুর সব মালপত্র শুঁকে তবে বেরোতে দিলো। এখানে খাবার, শস্য, বীজ আনা বারণ। তখন বুঝিনি পরে জানলাম যে এখানে নানান উইড্স ও exotic ওয়ার্ম যাতে না ঢুকে পড়ে তাই জন্য এই ব্যবস্থা।

রাস্তায় দেখেছিলাম সবুজ দ্বিপের দামাল মানুষদের। যাঁরা প্রকাশ্যে চুম্বন ও ঘনিষ্ঠতা করছিলেন। মদের নেশায় মাতাল এই মানুষেরা প্রতিটি বারের সামনে জটলা করে ইস্টারের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তার মধ্যেও অত্যন্ত ভদ্রভাবে আমাদের খাবারের দোকান দেখিয়ে দিলেন। মনে মনে বললাম : লাখো সেলাম সবুজ মানুষ। তোমাদের চোখে লাল আলো। ডানা থেকে ঝরুক রাশি রাশি সোনালী পালক। ঘুচুক অন্ধকারের অশেষ কালো। আবার আসিবো ফিরে টাসমানিয়ার তীরে, সুখবৃষ্টি নায়ে ধেয়ে। পরের বার আসবো গাড়ি নিয়ে, জাহাজে। জাহাজ ভ্রমণ নাকি অপরূপ। বললেন আমার প্রতিবেশী যিনি সম্রাট আলেকজান্ডারের দেশের মানুষ।

বনঙ্গ ডাইরি

আমার – ছায়া ঘনাইছে গল্পটা লেখার জন্য আমি গিয়েছিলাম চিকমাগালুর ("The town of the younger daughter" in Kannada language) নামে কর্ণাটকের একটি জায়গায় । ওখানে একটি স্যাঙ্চুয়ারি আছে । নাম ভদ্রা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙচুয়ারি । শুনেছিলাম বর্ষাকালে খুব জোঁকের উৎপাত । গাছ থেকে ঝরে ঝরে পড়ে । আমরা অবশ্য ছিলাম তাজের একটি হোটেলে । সেখানে আর জোঁক কোথায় ! কিন্তু গল্পের প্লটটি পরে অন্য জায়গায় ফেললাম । কারণ ভদ্রা সেইভাবে দেখা হলনা ।

নাহলে বহাল তবিয়তে কটা দিন কাটানো গেল । সূর্য্যের প্রথম আভায় যখন দিগন্ত লাল ঠিক সেই সময় শুদ্ধ কফির ঘ্রাণে মাতোয়ারা আমরা আমাদের এস ইউ ভি করে চলে যেতাম দূরে ।

সোনারঙা সূর্যমুখী ক্ষেতের গা ঘেঁষে নাম না জানা কোন গাঁয়ে । মাথায় কাঠ কুটো নিয়ে কৃষ্ণকলিরা যেখানে পথ জুড়ে চলেছে । জানা গেল বাবা বুদান গিরি নামে কাছেই একটি পাহাড় আছে । এই পাহাড়ে হয় কফির চাষ । সারা দক্ষিণভারতই তো কফির দেশ । ওরা কফি ভিজিয়ে খায় । চায়ের মতন । আমিও খাই । আমি যে দক্ষিণী নই তা নিজেই মাঝে মাঝে ভুলে যাই । কলকাতায় গেলে নিজেকে বড় দলছুট মনে হয় আজকাল ।

বাবা বুদানই প্রথম আরব থেকে কফির বীজ এখানে নিয়ে আসেন, জানা গেল । তার আগে এই অঞ্চলে কফির চাষ হতনা । এখন কফি রিসার্চ ইন্সটিটিউট রয়েছে । তাজের হোটেল তো ! অসংখ্য ফুলের সমারোহের মাঝে আমাদের ঘরের বারান্দা থেকে দেখা যায় একটি দোলনা । অনেকে দুলছেন । পাশেই একটি গাছে দুলছে একটি দোয়েল । ভারি মনোরম দৃশ্য ।

প্রকৃতি আমার ঘর, আমার সখা । তার মাঝে আমি সব ভুলে যাই । গাছ থেকে ফুল ঝরে পড়া আর পাখির ডাক আমাকে পাগল করে দেয় !

এরকম পরিবেশেও কি করে লোকে নাক ডাকিয়ে ঘুমায় দেখলে অবাক লাগে ! ভদ্রলোক, যেন শুধু ঘুমতেই এসেছেন এই সুন্দর বনভূমে । আর থেকে থেকে মদিরা পান করছেন । মনে হল ব্যবসায়ী শ্রেণীর মানুষ । পেটের কাছটা এম আর এফ এর টায়ারের মতন । ফ্যাটের চোটে হাফ পেন্টুলুন ওনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে ।

অবাঙালী ব্রাহ্মণরা নিরামিষাশী কিন্তু মদ খাবার বেলায় কোন ধর্মের ধার ধারে না । তখন আকণ্ঠ পান করে মাটিতে গড়াগড়ি । এদিকে মুখে বলবে- বাঙালীরা তো পুজোতেও মাছ দেয় !

মনে মনে বলি- ভালো মোর দাদা !

আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা ! আপাতত: ব্রাহ্মণ হয়েও আমি দ্বিপ্রাহরিক ভোজন পর্বে খুব বাছুর খেলাম । সঙ্গে বাদামের সরবৎ । তারপর একলা হেঁটে চলে গেলাম ভদ্রার পথে । ভদ্রায় খুব বাঘের উৎপাত । বাঘের পায়ের ছাপ ধরে টুরিস্ট ঘোরা ফেরা করে । কিন্তু আমার কপাল খারাপ । ভদ্রা বর্ষার জন্য বন্ধ । জাস্ট আগের দিনই বন্ধ হয়েছে ! কপালে না থাকলে যা হয় !

পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা গেলে দেখা যায় বড় সুন্দর শোভা । নানান রং । কোথাও লাল, ঘন নীল, বেগুনী, স্বর্ণাভ, গাঢ় সবুজ ---- সে ভারি চমৎকার । চোখের ও মনের তৃষ্ণা মেটে । গেয়ে উঠি - দু এক কলি । সঙ্গীরা আবদার করে । গাও গাও- গলা তো বহুদিন সাধিনি !

কতকাল প্রিয় মালকোষের তান ঝঙ্কৃৎ হয়নি হৃদয়ে । তবু অনুরোধে বাধ্য হই গাইতে ।

কেন পারিনা আজকাল - বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী সাবলীল ভাবে গাইতে ? সুরের ভাষা কি ভুলে গেছি ? মাঝে মাঝে মনে হয় সব সুরগুলো যেন জমাট বেঁধে কথা হয়ে গেছে ।

ভদ্রা ছেড়ে চলে এলাম । আয়েষ করে সন্ধ্যেবেলা কফি ছেড়ে গ্রেপ জুসে এক চুমুক দিলাম । এক বাঙালি পরিবারের সাথে আলাপ হল । প্রবাসী,

বাংলা কম জানেন। হিন্দীটাই বেশি জানেন। সবাইকে ভেজে দেন অথবা কবরিস্থানে খুল্লাম খুল্লা করে আসেন। ইত্না দুক হয়না, জিগরকা টুকরা দর্দ দেন, এইসব ছাইপাশ – বাংলা জানেন অষ্টরম্ভা, আমারই মতন।

সুইমিং পুলে মাতামাতি করছিল দুপুরে। উপমন্যু চ্যাটার্জির লেখা নিয়েই বেশি আলোচনা হল। আজকাল যা হয় আমার, কিছু কথা শোনার পরে অটোমেটিক্যালি একটা সুইচ অফ হয়ে যায়। মনের সুইচ। কথাগুলো যখন ভারী শব্দের মতন আছড়ে পড়ে আমার ওপর আমি নীরব হয়ে যাই। বন্ধুরা ঠাট্টার ছলে বলে – সবিকল্প সমাধি। সত্যি যদি সমাধিস্থ হতে পারতাম! ভুলে যেতাম সব হিংস্র কুকুরের কথা। ভদ্রার কিংবা দুনিয়ার।

বন্য কুকুর ভীষণ হিংস্র। তা মানুষই বা কম কিসে? সেদিনই তো কাগজে পড়লাম, সামান্য সম্পত্তির জন্যে বৃদ্ধ বাবাকে মেরে পুঁতে দিয়েছে এক ইঞ্জিনীয়ার। এই যদি উচ্চশিক্ষিতের নমুনা হয় এর চেয়ে ক্লাস ৮ পাশ হোটেলের ফয়সলই ভালো যে কাজের শেষে রাত আটটায় ছুটি নিয়ে নীলচে পাহাড়ে দরিদ্র বাচ্চাদের পড়াতে যায়। শীতের রাতে কাঁপতে কাঁপতে বাবা বুদান গিরির লাল জমিতে হওয়া কফির গ্লাসে চুমুক দেয়। আমি দিই, তবে তাসের নয় তাজের ঘরে। তাসের হতেও পারে। কে জানে? কে বলতে পারে? ভবিষ্যৎ তো অজানা। সভ্য জগতে যে আমার ফিরতে ইচ্ছে করেনা। সাজানো সংসার, বড় গোছানো, কোনদিন তাসের ঘর হয়ে যাবে কিনা কে বলতে পারে?

সংসার যে সাধনার পথে বড় বাধা! সেই সবিকল্প সমাধি! তৎ ত্বম অসি, That thou art ---

ভরসা এটাই যে জীবন পথের সাথীও সমাধিস্থ হবার আশা করে।

Remove your thoughts, attain thoughtless state, dissolve your ego and merge into brahman ----

এই তো আধ্যাত্মবাদ ! লোকের বুঝতে এত অসুবিধে হয় কেন ? কেন হিন্দু, মুসলিমে এত হানাহানি ? তৎ তম অসি কোথায় ? কোথায় ভগবান ? পরমানন্দ স্টেটে যাবার জন্যে এত হিংসা কেন ? হিংসা কি করে আনন্দ দেবে ? এই সামান্য বোধ কেন হয়না তাবড় তাবড় জ্ঞানীদের ?

আজকাল জ্ঞান বোধহয় বাজারে কিনতে পাওয়া যায় ! কাগজের টুকরো, এই পাশ ঐ পাশ ! আসলে ধপাস্ । গুলি মারো ! হাজার হাজার পাশ জীবনের পরীক্ষায় শুধু ফেল দেবে । মণি ভৌমিক কাদের জন্য কোড নেম গড লিখে সময় নষ্ট করছেন ? বলিউডি ধামাকা – গ্যাঙস্টার সিনেমা মনে পড়ে ? জনপ্রিয় গান – ইয়া আলি রহম আলি, ইয়া আলি-- গানের সারমর্ম কি ? সেই dissolve your ego and merge into brahman – মোদ্দা কথা হল আমরা বুঝতে চাইনা । আমাদের যাতে সুবিধে হয় আমরা সেরকম করে গড়ে নিই সবকিছু । বিজ্ঞান, কবিতা, আধ্যাত্মবাদ কিংবা খুনসুটি !

কফি নিয়ে আসা সুফি সাধক বাবা বুদান সম্পর্কে মজার জিনিস জানা গেলো । উনি কফির বীজ আনেন লুকিয়ে । সোজা কথায় স্মাগেল করে । উইকিপিডিয়া জানাচ্ছে :

Dattagiri/Baba Budangiri is the location of a small Sufi shrine devoted to the saint Baba Budan and Guru Dattatreya. They were revered by both Muslims and Hindus. Its origin appears to be a syncretization of reverence for an 11th century Sufi, Dada Hayath (Abdul Azeez Macci); for the 17th century Sufi Baba Budan, said to have brought coffee to India; and for Dattatreya, an incarnation of Shiva. It has been controversial due to political and religious tension over its status as a syncretic shrine.

মুসলিমদের জিহাদের অর্থ আজকাল নিরীহ মানুষ মারা । যেখানে মূল অর্থ – অন্তরের অরিকে দমন করো । বাড়ে উগ্রপন্থী । বাড়ে সমস্যা । সারা দুনিয়া জুড়ে । হোটেল কর্মী ফয়সল বলে : আমরা মুসলমানেরা

সবাই মন্দ নই ম্যাডাম ! ওর সরল চোখের দিকে চেয়ে কথাগুলো এমনিই বিশ্বাস হয়ে যায়।

এখানে এক মুসলিম ভদ্রমহিলা আমাদের একটু উপকার করেছিলেন তারপর বার বার বলছিলেন : গো অ্যান্ড টেল হিন্দুজ দ্যাট উই মুসলিমস্ আর নট টেররিস্ট। উই হেল্প পিওপেল। উই ডোন্ট কিল পিওপেল।

আমিও তো সেটা জানি কিন্তু উগ্রবাদীরা জানেন কি ? আর নেতা থুড়ি ন্যাতারা ? তা ভারতে তো ন্যাতা, নেতা কৈ ??

বিরিঞ্চিবাবার মতন বলতে সাধ জাগে – বলি মণি ! কার জন্য লিখছো ? বুঝবে কে? লোক কোথায় ? ফেলে দাও ফেলে দাও ফেলে দাও ! হুঙ্কার বাড়ে জ্ঞান কমে। খেয়োখেয়ি বাড়ে, ঈর্ষা বাড়ে কথা কমে যায়, কারো কারো। যেমন আমার। লিখবো কি ? কথা কোথায় ? ভাষা তো ভুলে গেছি কথা বলার। বাংলা ফাংলা বেমালুম ভুলে গেছি। লোকে বলে সাহিত্যিক হবেন। কোথায় ? সেগুড়ে বালি !

ভাষা ভুলে গেলে সাহিত্যিক কীদৃশ ? মুখ হাঁ করে, তাতে থাপ্পর মেরে : হু লা লা, ওয়াও ওয়াও করে কী আর সাহিত্যিক হওয়া যায় ! লেখা যায় না। লেখা আসে। কারো কারো কাছে নববধূটি সেজে। তাকে যত্ন করে নিজগৃহে তুলে রাখতে হয়। বরং ঝর্ণা দেখে আসা যাক। যত পারো প্রাণ ভরে দেখো ! এই চিকমাগালুরে অনেক আছে। নদী, ঝর্ণা। প্রকৃতি কথা বলে। পশ্চিমঘাট পর্বতের এই রাজ্যে সাদা কফিফুলে ঢাকা পথ দিয়ে যেতে যেতে ভাবছিলাম – প্রকৃতি তো দিব্যি খুশিতে ডগমগ। মানুষের এত দু:খ কেন তবে ? কিছুই কি হারায়নি তাহলে ? খুঁজে দেখতে হচ্ছে, কি কি রয়েছে লুকানো। অরূপ রতন। সময় তো এখনো আছে, সন্ধানের। অন্তর্দৃষ্টির। আত্মজাগরণের।

পেপার, কাজুবাদাম এইসবের চাষও হয় এখানে। দেখলাম। কর্ণাটকের সব চেয়ে উঁচু চূড়া mullain giri এখানেই অবস্থিত। উচ্চতা : ৬৩১৭ ফিট। তুঙ্গ ও ভদ্রা দুটো আলাদা নদী। একটা জায়গায় মিলে হয় তুঙ্গভদ্রা। এই নদীগুলি এবং নেত্রবতী, হেমবতী, বেদবতী সবই এই পাহাড় থেকে

সৃষ্ট । দক্ষিণে এই এক মজা । বরফ নেই নদীর উৎসস্থল আছে । নদীর প্রথম জল ভূগর্ভস্থ অথবা তা বৃষ্টি দ্বারা সঞ্জীবিত ।

বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য মেলে । চিকমাগালুরের কুদ্রেমুখে, এশিয়ার বেশ কিছু নামজাদা লোহার কারখানা আছে । রামায়ন - মহাভারতের গল্পে পড়া বহু স্থানও এখানে রয়েছে ।

বেশ কিছু দেখলাম । বেশ কিছু অনুভব করলাম । আজকাল অনুভবেই বিশ্ব দেখি । ফিজিক্যাল নয় মেন্টাল ট্র্যাভেল করি । মুক্তি খুঁজি ।

এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলো,

আমার মুক্তি ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে !

রবীন্দ্রনাথ যখন তৎ ত্বম অসির কথা বলেন, ঠিক এইভাবেই বলেন । এখন বলছেন লেজার সায়েন্টিস্ট মণি ভৌমিক অথবা আন্তর্জাতিক ম্যানেজমেন্ট গুরু স্বামী সুখোবোধানন্দ কিংবা আই জি নোবেল প্রাইজ পাওয়া ডা: দীপক চোপড়া । তার আগেও বলেছেন বিবেকানন্দ, পরম হংস যোগানন্দ । আমরা শুনিনি । পুঁথি পড়ুয়া না বললে যে ঠিক বিশ্বাস হয়না দাদা ! স্যার জগদীশচন্দ্র বসু যখন উপনিষদ পড়ে জড় দেহের প্রাণ নিয়ে গবেষণায় ব্রতী হন আমরা আড়ালে বাঁকা হাসি দিই--আবার মার্কোনি সাহেব যখন বেতার আবিষ্কার করেই ফেলেন তখন মুষড়ে পড়ি ! ইস্, যোগাযোগ ব্যবস্থাটা যদি তখন দ্রুতগামী হত !

দ্বিচারিতা আমাদের মজ্জায় মজ্জায় । তৎ ত্বম অসি লজ্জায় জিভ কাটে ।

-গার্গী, তুই বড্ড ফিলোসফিক্যাল লেখা লিখিস ! আমরা বুঝতে পারিনা ।

তার চেয়ে এখানেই ইতি । চলি ভাই । আবার ব্যাঙ্গালোর ফিরতে হবে । অনেকটা পথ । অরণ্যের হাতছানি ভুলে ইট কাঠের বনে মন দেবো ।

পারলে অসাধারণ শৈল্পিক কারুকার্য সমৃদ্ধ বেলুড়, হলেবিড় ও পুণ্য ভূমি শ্রবণ বেলাগোলাটা দেখে যাবো, বাড়ি যাবার পথেই পড়বে তো ।

নাহলে মনে মনেই, কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা : মনে মনে ---

বি দ্র : আমি ফেরার সময় তাজের হোটেল থেকে একটি দারুণ বই কিনে এনেছি হাজার ২ টাকা দিয়ে, বইটি আমাদের ঘরেই রাখা ছিলো । নানান রেসিপি ও তার ইতিহাস, কাল নিয়ে বিস্তারিতভাবে লেখা -- কিছু বাঙালী রান্নাও আছে । বিখ্যাত মানুষের বিভিন্ন রান্নার রেসিপি লেখা আছে, মাঝে মাঝে বানিয়ে খাই । খুবই সুস্বাদু কপিরাইট ইস্যুর জন্যে এখানে দেওয়া যাবেনা !!

শ্রবণার পথে

বেলুড় -হালেবিড়ের অসাধারণ শিল্পশৈলী দেখে ফেরার সময় একটা জায়গায় দেখলাম ভীষণ ভীড় ।জানা গেল ওটা শ্রবণবেলাগোলার পথ । শ্রবণবেলাগোলা শব্দের অর্থ হল পাহাড়ের ওপরে একজন সন্ন্যাসী । তীর্থযাত্রীরা চলেছেন সার বেঁধে । বেশীর ভাগই জৈন সম্প্রদায়ের মানুষ। আমরাও গাড়ি থেকে অবতরণ করে এগিয়ে চললাম । ছোটবেলায় সোসাল স্টাডিস বইতে পড়েছিলাম এই জায়গার কথা । স্বচক্ষে দেখবো ভাবিনি । আসলে আমি যে কোনদিন দক্ষিণ ভারতবাসী হব, ভাবিনি । ভাবতাম হয় বিদেশে থাকবো নয়ত কলকাতায় । সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সংস্কৃতির এই প্রদেশ আজ আমার নিজের বাড়ির মতন হয়ে গেছে । দক্ষিণীদের ভালবেসে ফেলেছি আমি। এখানকার কৃষ্টি, কলা, নানান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমাকে মুগ্ধ করে । এরা একই সঙ্গে আধুনিক আবার ভারতীয় সংস্কৃতির বাহক । এটাও খুব ভালোলাগে । শুধু কার্ড রাইস (দই ভাত) আমার সহ্য হয়না । কর্ণাটকের হাসান শহর থেকে মাত্র ১ ঘন্টার রাস্তা । গোমতেশ্বরের একটি মোনোলিথিক মূর্তি আছে এখানে । তালকাড়ের গঙ্গারাজাদের কমান্ডার ইন চিফ, চামুন্ডরায় এই মূর্তিটি ৯৮১ এডি তে গ্রানাইটের ওপরে খোদাই করান, অরিস্তনেমি নামক একজন শিল্পীকে দিয়ে। প্রায় ৬০ ফিট উঁচু এই মূর্তি এমনিতেই যথেষ্ট আকর্ষক । পৃথিবীতে এতবড় উন্মুক্ত স্ট্যাচু আর নেই । এই বিশালত্ব মন্দির প্রাঙ্গন ছাড়িয়ে একমনে দাঁড়িয়ে আছে, ব্যাকগ্রাউন্ডে নেড়া বিন্ধ্যগিরি । কোন কোন ঋতুতে বা বসন্তে ফুলের রঙ এ ভরে যায় চারিপাশ ।

গুলমোহর ফুল ঝরে যায়, শাখায় শাখায় --গোমতেশ্বরের সৌন্দর্য্য বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয় এই রক্তিম আভা । কোন পরিষ্কার দিনে এই মূর্তি অনেক দূর থেকেও দেখা যায় । আগে ঘনজঙ্গল থেকেই সাধুরা তাদের খাবার পেয়ে যেতেন । পরে আস্তে আস্তে মন্দির তৈরি হতে থাকে । জনসমাগম বাড়তে থাকে বলে জানা গেলো নানা তথ্যভান্ডার ঘেঁটে ।

মহামস্তকঅভিষেক হল এই তীর্থস্থানের একটি মহোৎসব । সেদিন এই মস্তককে লিটার লিটার দুধ, মধু ও নানান ভেষজ দিয়ে স্নান করানো হয়। যখন এইগুলো মূর্তির গা বেয়ে নিচে পড়ে তখন মনে করা হয় যে তা বিশেষ এক শক্তি পায়, যা গ্রহণ করলে মানুষ মোক্ষের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন । ভক্তরা এইগুলো নেবার অপেক্ষায় থাকেন । ১২ বা ১৪ বছরে একবার এই উৎসব হয় । বিশেষ তিথি নক্ষত্র দেখে এই উৎসব পালিত হয় । ২০১৮ তে এই উৎসব । মূর্তিটি এত বড় যে নিত্য স্নান করানো সম্ভব হয়না তাই পদযুগল শুধু ধুয়ে দেওয়া হয় । বহু মানুষ দূর দূরান্ত থেকে আসেন । পান্থশালাগুলো মূলত: জৈন সম্প্রদায়ের মানুষেরা চালান । খুব পরিষ্কার এইসব জায়গাগুলো । হয়ত আড়ম্বর নেই তেমন কিন্তু আন্তরিকতা আছে । হৃদয়কে ছুঁয়ে যায় সেই সেবা । এমনিতে আমি পাঞ্জাবীদের দেখেছি যে যতই প্রতিষ্ঠিত হননা কেন গুরুদোয়ারাতে কোন নোংরা দেখলে নিজের ওড়না দিয়ে মুছে দেন । আমরা যেমন মন্দির নোংরা করতে ওস্তাদ । শেভরলে বা প্যাজেরো থেকে নামছি কিন্তু মন্দির প্রাঙ্গনেই নিষ্ঠীবন ছড়াচ্ছি ।কোন সিভিক সেন্স নেই আমাদের । পপকর্ন খেয়ে প্যাকেটখানা ওয়েল মেইনটেন্ড পার্কে ফেলে গটগট করে চলে যাচ্ছি । নিজেরটা ঠিক থাকলেই হল অন্যদের সুবিধা অসুবিধা দেখার তো দরকার নেই ।

লেকচার দিয়ে দিলেই হল খানিকটা । আর কি চাই ?

জৈনরা খুব পরিষ্কার হন, লক্ষ্য করলাম । নিরামিষ খাবার যে এতো চমৎকার স্বাদের হয়, না খেলে বোঝার উপায় নেই । এমনিতেই দক্ষিণীরা খুব ধার্মিক হন । জৈনদেরও দেখলাম খুবই ভক্তি ভরে ও নিষ্ঠা সহকার আচার অনুষ্ঠান করছেন ।খাঁড়া সিঁড়ি বেয়ে অবলীলায় উঠে যাচ্ছেন মানুষজন । আমি নিচে থেকেই সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে এলাম, কারণ আমার অত সিঁড়ি চড়ার ক্ষমতা নেই ।

পদপল্লবে আমার প্রণাম জানিয়ে ফিরে এলাম । আকাশের অস্তরাগে পাহাড়, অরণ্য, মন্দির মায়াময় । ভ্রমণ এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা । আর আমার, এই স্থানের কাছে সবথেকে বড় পাওয়া হল, যোগসাধনায় উৎসাহ । অমৃতপথের

যাত্রী আমি, এই অপরূপ তীর্থক্ষেত্রকে বিদায় জনিয়ে চললাম সাংসারিক জীবনে । মনটা কিন্তু পড়ে রইলো রহস্যময় গোমতেশ্বরের চরণে । জানি আসবো ফিরে একদিন আবার, যোগসাধনার অন্তে। সেদিন উচ্চারিত হবে একটিই নাদ - অহম ব্রহ্মাস্মি ।।

পিকনিক

অস্ট্রেলিয়ায় আমরা খুব বেড়াই। এত অল্পদিন হল এসেছি অথচ এরই মধ্যে বেশ কিছুটা ঘুরে নিয়েছি। একদিন এক সাহেব আত্মীয় তাঁর ফার্ম হাউজে আমাদের নেমতন্ন জানালেন পিকনিকের জন্য। অ্যারারাট নামক ছোট শহরের কাছে ফার্ম হাউজ। একদিকে নীল পাহাড় অন্যদিকে মায়াবী মেঘ। ভেড়ার পাল। মোট ১৫০০০ ভেড়া আছে ফার্মে। কেউ বড় কেউ কচি। সবুজ গালিচা মোড়া মাঠে চড়ে বেড়াচ্ছে নিজমনে। একটি বেশ বড় বাড়ি যার মালিক আমার আত্মীয় স্যালি ও তাঁর স্বামী পিটার। বাড়িতে বহু ঘর ও আধুনিক আসবাবপত্র। মজার ব্যাপার হল সেটি তালা খোলা অবস্থায় থাকে- কেউ প্রবেশ করেনা। আমরাও দরজা খুলেই ঢুকলাম। ছেলেবেলার রূপকথা স্নো হোয়াইট এর সেই নিঝুম বনবিতান মতন এক বাড়ি শুধু সাত বামনের বদলে স্যালির দুই লম্বা ছেলে যাঁদের উচ্চতা সাড়ে ৬ ফিটের বেশি। সেখান থেকে কাঠ কুটো এনে মাঠে জড়ো করে আগুন জ্বালানো হল। দাউদাউ করে জ্বলছে বহ্নিশিখা ! মাংস, মাছ সেঁকে নেওয়া হল তাতেই। আর পাউরুটি। কেউ কেউ সবজিও পুড়িয়ে নিলেন। তারপর মাখন মেখে খাওয়া হল। ওয়াইন, কোল্ড ড্রিংক্স তো ছিলই। অসম্ভব হাড় কাঁপানো শীতে হাতে কাগজের প্লেট নিয়ে খাওয়া এক আজব অভিজ্ঞতা। একটি বাচ্চা ভেড়াকে কোলে নিতেই তার মা তেড়ে এলো। ল্যান্ড ক্রুজারে করে চষে বেড়ালাম পুরো ফার্ম। বেশিরভাগ গাছেই কোরকের চিহ্ন নেই, ঝরে গেছে সবুজ।

কিছু কিছু নাম না জানা মহীরুহ থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি সুবাস। দুলছে শাখাপ্রশাখা নাচছে কালো কালো কিছু পাখি ! একটি মেষশাবককে কোলে নিয়েই ঢুকে পড়লাম রহস্যময় বাড়িটিতে।

সেখানে আর্ল গ্রের গরম চা খেয়ে প্রাণ জুড়িয়ে গেলো। দূরের নীল পাহাড়ে তখন হালকা কুয়াশার ওড়না।

ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি শুরু হল ! জ্বলন্ত উনুন নিভতে শুরু করলো । আলাপ হল টম ডিক হ্যারির সাথে !

ওদের বাবা মায়েরা বললেন --এই বছরই আলাস্কা বেড়িয়ে আসবো ! এরপরে ওদের ১৮ হয়ে গেলে আমাদের সঙ্গে আর যাবেনা ! মুখে যেন একটু বেদনার আভাস ! আসলে নিয়ম যাই হোক, সংস্কৃতি যেমনই হোক মানুষ তো সেই রক্ত মাংস জিন আর হরমোনের সমষ্টি ! অতএব---

চা পান করে বেরিয়ে পড়লাম । ফেরার পথে একটি ওয়াইন মিউজিয়াম দেখে এলাম । বহু পুরাতন সুরাপাত্র ও সুরা রয়েছে । প্রতিটির কথা লেখা নিচের লেবেলে ! কীভাবে কোন দেশে কোন কোন ওয়াইন স্বীকৃতি পায় সেইসব । আঙুরক্ষেত অবশ্যই দেখা হয়নি !

ও হ্যাঁ বলা হয়নি ওপেন এয়ার পার্টিতে আমি একটি বাংলা গান গেয়েছিলাম ।

আশা ভোঁসলের = = : বধূয়া রিমিঝিমি এই শ্রাবণে, চাই যেতে অভিসারে !

পরে দেখলাম ভাঙা ভাঙা বাংলায় অনেকেই এই গান গাইছেন ! বিশেষ করে রিমিঝিমি কথাটি ওঁদের খুবই মনে ধরেছে ! ফেরার সময় একজন হাত নেড়ে বললেন :

বাই বাই ঋ-মি-জি-মি ----------!!

সমুদ্র মন্থন

আবার ঘোরা। এবার জিলং। আমার বাড়ি থেকে প্রায় ৪৫ মিনিটের পথ। চওড়া রাস্তা। ফ্রি ওয়ে। দুপাশে গাঢ় সবুজ গাছ, ফ্যাকাসে মাঠ ঘাট। কোথাও পাহাড়ের রেশ। এইভাবে চলতে চলতে চলে এলো জিলং। এটি একটি অ্যাব অরিজিন্যাল শব্দ যার অর্থ জমি। মূলত: জাহাজের ডেরা অর্থাৎ পোর্ট হলেও এর ঐতিহাসিক দিক ও একটি আছে। এখান থেকে হেলিকপ্টারে চড়ে সমুদ্রের কিনারা বরাবর ঘোরা যায়।

আমার ঘুরলাম। হেলিপ্যাড জলের ওপরে। অর্থাৎ ভ্রমণ শেষে সেটি নামে জলের ওপরে, নৌকার মতন। দূরবীন নিয়ে ওপর থেকে দেখা গেলো সুন্দর দৃশ্য। কোথাও মেটে কোথাও পাথুরে রুক্ষ বনভূমি। জলের রেখা সফেদ অথবা রূপালী। ছোট ছোট জনপদ। মেছো মানুষের জলকেলি ইত্যাদি। ওপরে সিকিউরিটির লোক ঘুরছেন। যদি কেউ জলে ডুবে যান তাঁকে বাঁচাবার জন্য। জলের ওপরে একটি রেস্তোরাঁ। অনেকটি জেটি আকৃতির। সেখানে বসে খেলাম মাছভাজা ও সুস্বাদু স্যালাড। আর একটি চীনা কেক। চীনা কেক যে এত অপূর্ব জানা ছিলো না। খুব একটা মিষ্টি নয় অথচ স্বাদ চমৎকার।

জলের ওপরে মাছের আনাগোনা দেখছিলাম আর মাছ ভাজা ভক্ষণ করছিলাম। কাছেই আছে সুবিশাল শপিং মল। সেখানে একটি ভারতীয় জয়েন্ট আছে নাম মুঘলাই দিয়ে কিছু একটা।

দুর্দান্ত আলু বেগুনের সবজি পাওয়া যায়। আরো অনেক কিছু। খুব রসিয়ে খাওয়া চলে।

ওদিকে Barwon River আছে। সবুজ গালিচা মোড়া নদী পাড়। রয়েল অস্ট্রেলিয়ান নেভির দুটি জাহাজের নাম জিলং এর নামে হয়েছে। এই স্থানটি মূলত: আদিবাসীদের হওয়ায় একটি প্রাগৈতিহাসিক বাতাস যেন হানা দেয় মাঝে মাঝে। আমি যখন ব্যালারাটে ছিলাম তখন একটি বাসে করে প্রায়ই জিলং -এ ঘুরতে আসতাম। পথ ভারি মনোরম। হালকা

বনভূমি, সবুজের সারি, পুরনো ক্ষয়ে যাওয়া গাছের ভগ্নাংশ, নীলাভ স্বপ্ন, এলোমেলো মেয়েরা, শিশু, ফুল,

আর সুন্দর সুন্দর কাঠের বাড়ি । পথে স্থানীয় মানুষ আর কোথাও বা ভারতীয় ও শ্রীলংকান । অস্ট্রেলিয়ার গ্রামছাড়া ঐ খয়েরি মাটির পথে ভারতীয় দেখে মজাই লাগতো !

এখানে ক্ষেতের ধারে দেখেছি একটি করে ক্রস লাগানো থাকে -কেন জানিনা । সেখানে এক ভারতীয় পাদ্রীকেও দেখেছি । আমার ব্যাপার তো ! হয়ত রাতে প্লেনে চেপে, বেরিয়ে সাতসকালে হাজির হলাম ওয়েস্টার্ণ অস্ট্রেলিয়ার খনি শহর -পার্থে । পার্থ পিছিয়ে কারণ ও পশ্চিমে । আমরা পূর্বে । অস্ট্রেলিয়া বিশাল দেশ তাই নানা টাইম জোন আছে এখানে ।

ভাইকে বললাম : ওঠ ! ওঠ ! আমরা এখন ক্যানবেরা যাচ্ছি ! ও চমকে উঠে বললো : মানে ! ঘুম ভেঙেই ক্যানবেরা !

বললাম : টিকিট ফিকিট সব রেডি তোরা শুধু সঙ্গে যাবি ।

কাজেই এইভাবেই আগে কতবার চলে গেছি জিলং । একবার তো বাস ড্রাইভার বলেই ফেললেন : জিলং এ রাতে হল্ট করবে না ? তুমি এইভাবেই ঘুরতে বেরিয়ে যাও তাই না ?

যাক্ বুঝেছেন তাহলে । মরণের পরে তো কায়াহীনা হয়ে ঘুরতে পারবো !

গার্গী শরীর ছেড়ে দিলো আনমনে--এখন স্পিরিট হয়ে ঘুরে বেড়ায় সবখানে !

একটি সাজানো শহর । নতুন ও পুরাতনের মেলবন্ধন । আদতে অ্যাব অরিজিনদের বাসভূমি, কাঠের এক সুদৃশ্য পালং, সমুদ্র নগরী রূপছায়া ঘেরা স্মার্ট -জিলং । আবার আসিবো ফিরে জিলং-এর তীরে ময়ুরপঙ্খী নায়ে ভেসে --শুষে নেবো সবটুকু সুধা মায়াবী আলোয়, জেটি হোটেলের বারান্দায় বসে । **সমুদ্র মন্থনের নেশায় ।**

ঘুমন্ত আগ্নেয় গিরি

অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস্-এ একটি ছোট ঐতিহাসিক গ্রাম আছে নাম তার লাক্ষ্লৌ । মিশেল হাইওয়ের ওপরে অরেঞ্জ নামক স্থান থেকে অল্প দুরে এই জায়গায় প্রচুর পরিত্যক্ত খনি আছে । আছে বহু মাইনার্স কটেজ । ১৮৫০ এর নানান খনন কার্যের নজির আছে । আছে ভূমিতলে জমে থাকা বালি যা খননের সময় থেকে দৃশ্যমান ।

এদিকে ভিক্টোরিয়া স্টেটে আমার পাড়া বিখ্যাত ও অখ্যাতর সমষ্টি । অস্ট্রেলিয়ান প্রাইম মিনিস্টার শ্রীমতী জুলিয়া গিলার্ডের বাড়ি আমার বাড়ির কাছেই । ফেডেরাল পুলিশের গাড়ি মানেই প্রধানমন্ত্রী সাহেবা এখন বাড়িতে আছেন । প্রথম বিশ্বের ফার্স্ট সিটিজেন আমার মতন এক স্লাম ডগের বাড়ির কাছেই থাকেন এ আমার পরম সৌভাগ্য । এছাড়াও আমার বাড়ির এলাকায় সামান্য পিপড়ের দলের বাস । এরা আজব চরিত্রের । মিষ্টি না খেয়ে খায় নন ভেজ । কমলালেবু গাছ, সবুজ আপেল গাছ, বাতাবীলেবু গাছ, মুসাম্বি গাছে আমাদের বাগান সমৃদ্ধ । কিন্তু ফল খাবার লোক নেই, সুমিষ্ট ফল ঝরে পড়ে পড়ে পচে যায় । পিপড়েরা সেই সুবিধা নিতে অক্ষম । কারণ ওরা মাংসাশী ।

এই মহাদেশ মাকড়সার দেশ । হেন কোনো মাকড়সা নেই যা এখানে দেখা যায়না এমনই মনে হয় মাকড়সার সংখ্যা ও টাইপ দেখে । এবার হয়ত ফলের রস ছেড়ে মাকড়সার রস পান করতে হবে ! এমন আজব রাজ্যে দু একটি আগ্নেয়গিরি না থাকলে চলে ? কাজেই আমাদের রাজ্য ভিক্টোরিয়া বহু মৃত আগ্নেয়গিরির জায়গা হলেও নতুন কোনো লাভা স্রোত বইতে পারে বলে ভূ বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন । তারই একটি হয়ত শুরু হবে ব্যাকাস মার্শে । আমার আজকের আলোচনার কেন্দ্র । ছেলেবেলায় চেয়েছিলাম ভূ তাত্ত্বিক হতে । বাবা রাজি হননি । হয়ত রুগ্ন কন্যার স্বাস্থ্যের কথা ভেবে । আসলে দেড় বছর বয়সে আমার একটি কঠিন ব্যাধি হওয়াতে জীবন সংশয় দেখা দেয় । তখন লাস্ট ড্রাগ নোন টু মেডিক্যাল

সায়েন্স, বেসিক্যালি অ্যাড্রিনালিন ইঞ্জেকশান অ্যাডমিনিস্টার করা হয়েছিলো। যদি বাঁচে তাতেই বেঁচে উঠবে। এবং কাজ হয়েছে। তেতাল্লিশ চলছে। বেঁচেই আছি।

দিব্যি -এখনো। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিতে বেড়াতে যাচ্ছি ! মেলবোর্ন শহর ছাড়ালেই ফ্রি ওয়ের ধারে স্যাটেলাইট শহর মেল্টন -*Melton* :: *home* of *harness racing*----***লেখা বোর্ডটা চোখে পড়ে। প্রায় সেখান থেকেই দেখা যায় ব্যাকাস মার্শের পাহাড়গুলি। ঢেউ খেলে গেছে আকাশের বুকে।*** ব্যাকাস মার্শ একটি অপূর্ব পাহাড়ি জায়গা যেখানে অনেক ক্ষেতখামার আছে। মূলত এখানেই রাজ্যের বেশি সবজি ও ফলের চাষ হয়। হয়ত আগ্নেয়গিরির মাটি বলে এত উর্বর। স্ট্রবেরি ক্ষেতে ঢুকে ফল তুলে যত খুশি খাও। গাঢ় বাদামী ক্ষেত ভারী মনোরম। নয়নাভিরাম।

(Bacchus :: from Greek *Bakkhos* ; related to Latin *bāc a* small round fruit, berry and

Marsh: tract of low wetland, often treeless and period ically inundated,
generally characterized by a growth of grasses, sedges, cattails, and rushes….Info Internet .)

সর্ব প্রথম যে সাদা চামড়া এই এলাকায় পা রাখেন তাঁর নাম Kenneth Scobie Clarke (c. 1806–79), a native of Sutherland in Scotland.

শুনেছি স্কটিশরা খুব ভালোমানুষ হয়। হয়ত আজকের ব্যাকাস মার্শের এই মনভোলানো চরিত্র এক ভালোমানুষের পদস্পর্শেই শুরু হয়েছিলো ! তার আগে ছিলো কুরুং উপজাতি। নদনদী, পাহাড়, ঝর্ণা, শিলাভূমি নিয়েই তাঁদের জীবন। বন্য পশু শিকার ও ক্ষেত খামার ছিলো জীবিকা। আজও এই এলাকায় সেই আদিম ছোঁয়া আছে। অর্চাডের ধারে বসে স্ট্রবেরি জুস খেতে খেতে মনে হচ্ছিলো যেন এক রূপকথার রাজ্যে বসে আছি। মালকিন পরিচিতা কারণ এখানে আমরা খুব আসি। এভিনিউ অফ ওনার

সত্যি এভিনিউ, ওক ও অন্যান্য গাছের নীলাঞ্জন ছায়া সৃষ্টি করা হয়েছে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সৈন্যদের শ্রদ্ধা জানাতে।

বৃক্ষরাজি হাত ধরে দাঁড়িয়ে সবুজ সবুজ ধুলো নিয়ে খেলছে। অর্থাৎ চারপাশে সবুজ ক্ষেত খামার। ক্ষেতে গিয়ে ফসল তুলে আনা যায়। পাওয়া যায় পোষা মুরগীর ডিম। অর্ডার দিলে হাঁসেরও। মানুষজন অতিথি পরায়ণ। স্ট্রবেরি ফেস্টে মানুষ অভিজাত। ওয়েল ম্যানার্ড।

কীটনাশক বিহীন ক্ষেতের কুমড়ো, কফি, আলু যার পোশাকি নাম অর্গানিক পেতে এখানে আসতে হবে। ক্ষেতের পেছনে রূপকথার পাহাড়। ওপরে একটি গীর্জা। ভেসে আসে পুণ্য ঘন্টা ধ্বনি। The Chicory Kiln ১৮৮৫ থেকে আছে দাঁড়িয়ে কয়েক পায়ে – একইরকম। সেই সময় চিকোরি শিকড় রোস্ট করে খাওয়া হত, কফিতে মেশানো হতনা। এই দালানে সেই চিকোরি রোস্ট করা হত। প্রাগৈতিহাসিক বাড়ি। সভ্যতার আদিম সোপান।

শহরের পূর্ব দিকে আছে একটি সুউচ্চ পাহাড়ি স্থল যেখান থেকে পুরো শহর দেখা যায়, অন্যান্য পাহাড়, দৃষ্টি নন্দন সবুজ বনতল, ক্ষেতখামার ও উপত্যকা। আশেপাশে আছে অনেক বনাঞ্চল ও ক্ষয়প্রাপ্ত পাহাড়ি শিলার ভাস্কর্য যার মধ্যে দিয়ে নদী বহমান। দেখতে গেলে আরো দূরে যেতে হবে। আছে প্রাচীন submerged Merrimu লেক। বন্য ভূমি বরাবর অনেকটা পথ গেলেও আমরা লেকটি খুঁজে পাইনি। শুধু পাখির কলকাকলি ও ফুলের গন্ধ মেখে ফিরে এসেছি। এদিকে পিকনিক হয় ও বহু মানুষ ছুটিছাটায় বার্বিকিউ করেন। আমার বাড়িতে সাজানো বাগিচায় আছে বার্বিকিউ করার একটি বড় চুল্হা। আমরা মাঝে মাঝে করি। তাহেরি পুলাউয়ের সঙ্গে বার্বিকিউ মন্দ কি ? ফিউশন ফুডের আমি বড় ভক্ত। সম্বরের মধ্যে পাস্তা দিয়ে খাই অথবা থকথকে বিফ স্যুপে দক্ষিণী ইডলি কিংবা লেবানীজ রুটির সাথে কষা কষা আলুরদম এক্কেবারে বাঙালী এস্টাইলে ! নাহ্ ! আমি আক্ষরিক অর্থেই ভেতো বাঙালী নই। আমি মানুষ।

লেকপথে অবশ্যই বেশ কিছু কাঠের বাড়ি দেখলাম যেখানে সুখ নয় পরম শান্তি বিরাজমান । বৃদ্ধ কাঠবাড়ি সূর্যাস্তে জলপাই ঢেউ সরিয়ে –পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে পাখির ডাকে জাগে ---

বহু বিখ্যাত মানুষের জন্ম এখানে । এঁরা স্থানীয় মানুষ । তার মধ্যে আমাদের ইন্টেরেস্টের একজন --

Dual Booker Prize winning author Peter Carey.....

আমার বাড়ির কাছে আছে একটি চিরহরিৎ গলফ্ কোর্স । আমি আজকাল গলফ্ খেলতে যাই । অকেশন্যালি । তবে গায়ে খুব জোর নাহলে বল দূরে পাঠানো যায়না বলে আমার পক্ষে একটু মুশকিল । কারণ আমার গায়ের জোর খুব কম । ছেলেবেলায় নানান খেলা খেলতাম । আবার সেই অভ্যাসটা বহুদিন পরে ফিরে এসেছে । গলফ্ নিয়ে একটি থ্রিলার লেখার ইচ্ছে আছে । গলফ্ ক্লাবের খাবার গুলি দূর্দান্ত । সেই উঁচুনিচু, সবুজ ক্রীড়াভূমি পেরিয়ে একটি বাঁক । তার কিছু দূরেই আমার বাড়ি । এই বাঁকে আছে লিটিল রেড রাইডিং হুডের বাড়ির মতন বাদামী চিমনি ও লাল পাথরের এক মহল । রহস্যময়, কুয়াশা কুয়াশা ।

ব্যাকাস মার্শে পাহাড়ি কুয়াশা আছে । কুয়াশার ওড়না সরালেই হাত বাড়ায় স্থানীয় শিল্পীরা । একের পর এক প্রকৃতির ছবি এঁকে চলেছেন তাঁরা ! বিক্রি হচ্ছে । কেউ শুধু দেখে চোখ সার্থক করছেন । মোচার বড়ার মতন এক বড়া পাওয়া যায় । আমরা খুব খাই । এক বাঙালি পরিবার এখানে ৩০ বছর ধরে আছেন অথচ জানেন না যে মোচার বড়ার মতন বড়া দোকানে পাওয়া যায় । আমি বলতেই বলেন : তুমি কী করে এগুলো খুঁজে পাও ?

সত্য হেসে বলি : এরজন্যে ভবঘুরে হতে হয় । পায়ে জুতোর বদলে জাদু জুতো পরতে হয় !

আমার এক ফিজিও থেরাপিস্ট ব্যাকাস মার্শে থাকেন। নাম তারা। অপরূপ সুন্দরী। ওকে বলি : তারা,বৃটিশদের নাম হয় নাকি এতো হিন্দু দেবীর নাম।

হেসে বলেন : আসলে আমিও সেটা শুনেছি। আমার নাম অবশ্য আমার ড্যাড টিভি সিরিয়াল অভিনেত্রী তারার নামে রেখেছেন। এই নামে একটি বিখ্যাত পাহাড়ও আছে।

(Tara (Serbian Cyrillic: Тара, pronounced [târa]), is a mountain located in western Serbia. It is part of Dinaric Alps and stands at 1,000-1,500 metres above sea level. The mountain's slopes are clad in dense forests with numerous high-altitude clearings and meadows, steep cliffs, deep ravines carved by the nearby Drina River and many karst, or limestone caves. The mountain is a popular tourist centre: Info :: Wikipedia)

ওকে বলি : ব্যাকাস মার্শে তো ভলক্যানো জেগে উঠতে পারে, বইতে পারে লাভার স্রোত। বলেন : না না এরকম কিছু হবেনা। গড ইজ গ্রেট অ্যান্ড কাইন্ড টু অল।

মনে মনে ভাবি : সত্যি তো কলকাতার আমরি হাসপাতালে তো মানুষ সুস্থ হতেই গিয়েছিলেন অথচ আজ অনেকেই মৃত। প্রতিটি মানুষই ভাসমান লাভা স্রোতে সুতরাং ব্যাকাস মার্শে আগ্নেয়গিরি শুধু কল্পকাহিনী !!

স্পিডবোটের স্পিডে

স্থবির বাঙালীর জীবনে গতির বড় প্রয়োজন। স্পীড স্পীড আর স্পীড। এই মনে করে এক সুন্দর সকালে হাজির হলাম মেলবোর্নের সেন্ট কিল্‌ডা বন্দরে যেখান থেকে ছাড়ে লোমহর্ষক স্পীড বোট। আমি অ্যাডভেঞ্চার প্রেমী, অ্যাড্রিনালিন রাশ দারুণ লাগে। তাই তো আসা!

গাঢ় লাল আপত নিরীহ বোটটিকে দেখে বুঝিনি তারপরের অধ্যায় কী হতে পারে। আসলে আমার বাড়ির কাছে সমুদ্রে ওয়াটার স্কুটার দেখে রোমান্টিক ভাবে মনে করেছিলাম যে স্পীড বোট ভ্রমণও এমনই হবে।

যাইহোক কফি টফি খেয়ে শুরু করলাম যাত্রা। কাফেতে এক সাহেব দম্পতি আলাপ করলেন। যখন শুনলেন যে আমরা স্পীড বোটে যাচ্ছি বহুবার বেস্ট অফ লাক জানালেন। কেন ঠিক বুঝিনি। একটু পরেই বুঝলাম যখন আমাদের দিয়ে বোটিং কোম্পানি একটি ফর্ম সই করিয়ে নিলো। তাতে লেখা : আমরা যদি জীবন্ত না ফিরি কেউ দায়ী হবেন না। এই ভ্রমণ খুবই বিপজ্জনক সেটা জেনেই আমরা যাচ্ছি। আমাদের অনুমতি নিয়েই বোটে তোলা হচ্ছে। যাত্রা সময় ৪৫ মিনিট কেটে ছোট করা হতে পারে যদি নাবিক সমূহ বিপদ দেখেন কিংবা যান্ত্রিক গোলযোগ লক্ষ্য করেন। তাই নিয়ে বাক্‌বিতন্ডা চলবে না।

সই করে দিলাম। জলে ডানাবিহীন ওড়ার সময় শুরু হবে এবার। মিস্টার অ্যান্থনি আমাদের সুপ্রভাত জানালেন। উনিই নাবিক। এসেছেন অ্যাডিলেড থেকে। এখানে মাস তিনেক হল বোট চালাচ্ছেন। নানান সুরক্ষার কথা, নিয়ম কানুন বলে দিলেন। বোটে উঠতে হল উঁচু একটি টুল বেয়ে। হাত ধরে নামালেন নাবিক প্রায় সবাইকে। সার বেঁধে বসার জায়গা অনেকটা ট্রামের মতন। গা ঘেঁষে ঘেঁষে। বেঁধে দিলেন বিশেষ সিট বেল্ট। বললেন : বেল্ট আঁকড়ে থাকবেন। নাহলে উল্টে যেতে পারেন। লাইফ জ্যাকেট সামনেই ছিলো। প্রয়োজনে বাঁধতে হবে। হল যাত্রাশুরু।

নানাবিধ রঙীন বোট পেরিয়ে সরু জলরেখা ধরে যেতে যেতে পৌঁছালাম সমুদ্রে। তিরতিরে ঢেউ হঠাৎ বিশালাকার। ঘন সবুজ জল ঈষৎ নীলাভ। আর অজস্র সিগাল পাখি ভেসে বেড়াচ্ছে ঢেউয়ের তালে তালে। মনে পড়ে জোনাথন লিভিংস্টোন সিগালের কথা। পর্বত প্রমাণ জলতরঙ্গ ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। টালমাটাল অবস্থা। বোট এগিয়ে চলেছে। একটি দিক উঁচু অন্য দিক নিচু, ক্রমশ দুলছে, টাল খাচ্ছে।

পেছনের সিটে চারজন সাহেব কিশোর আর মাঝখানে আমি ও পতিদেব। ব্যস্ আর কোনো যাত্রী নেই। আমার তো প্রথমে বেশ ভয় লাগছিলো। কিন্তু যখন মাঝ সমুদ্রে চলে গেলাম তখন আমার আর কিছুই করার নেই। ডুবে গেলেও আমি অসহায়।

যদিও চালক বলছিলেন যে এই বোটে এমন টেকনোলজি আছে যে ডুবে যাবার কোনো সম্ভবনাই নেই। জল ঢুকে গেলেও নৌকো ভাসবে। ততক্ষণে রেস্কিউ টিম চলে আসবে। দুই ইঞ্জিন মিলে ১ সেকেন্ডে ১৩০০ লিটার জল পাম্প করে যা দিয়ে ২৭ সেকেন্ডে একটি পূর্ণ সুমিং পুল ভরে যেতে পারে। বোট দুলছে। ভীষণ। বড় বড় ঢেউ। তাদের স্পর্শে নিজেকে লিলিপুট মনে হচ্ছে। যেন সামুদ্রিক গোলাবর্ষণের সামনে আমরা নিরীহ মেষশাবক।

মেলবোর্নের সমুদ্র খুব মেজাজি। ঘন ঘন রঙ ও চরিত্র বদলায়। তাই বিশাল ঢেউ আসাতে আমাদের ভ্রমণ মোট ২০ মিনিট হয়েছিলো তাতে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। পুরো ৪৫ মিনিটের যাত্রা নাহলেও মনে হল পয়সা মার যায়নি।

অসম্ভব জোরে দুলতে দুলতে বোট ঢেউয়ে দিলো ধাক্কা। এই-ই – ই- ই ঢাই !

ধুপ-ধাপ।

যেন উল্টে গেলো। আমরাও ভেতরে বেসামাল। আবার নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলো পরবর্ত্তী ঢেউয়ের দিকে। আছড়ে পড়ছে এক এক করে

দানবীয় ফেনা। সমুদ্রনীল ভীষণ ঘন। ভয়ে আমি থরহরি কম্পমান। চূর্ণ বিচূর্ণ। মানব জমিন চুরমার।

জানা গেলো এবার বোটটি শুন্যে লম্ফ দেবে। অনেক উঁচুতে উঠে গিয়ে লাফিয়ে নেমে আসবে ঢেউ-এর বুকে। সবাইকে প্রস্তুত হতে বললেন নাবিক। নিজেকে ইঁদুর মনে হচ্ছে। ভাগ্যের হাতের ইঁদুর। সম্মুখে মার্জার -ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া! এদিকে অনেকটা লম্ফ ঝম্প হয়ে যাওয়াতে আমার শরীরে বেশ খানিকটা চোট লেগেছিলো। হাত- পা বেশ ব্যাথা করছিলো।

দূরে মেলবোর্ন শহরের স্কাইলাইন। দেখা যাচ্ছে আরো নৌকো, কোনোটা বিলাস বহুল তো কোনোটা মৎস্যশিকারির বোট। কেউ বা প্রাইভেট বোট নিয়ে নেমে পড়েছেন। সুদৃশ্য সেইসব নৌকো পেরিয়ে আমরা এবার শুন্যে লাফ মারবো। ওয়ান টু থ্রি বলতেই লাফ! উঠে গেলাম আকাশে। চারপাশের নৌকোগুলো টয় বোটের মতন লাগছে! আমার তো ভয় লেগে গেলো। এমন সময় নেমে এলাম নিচে এক ঝটকায়! হাত পা পেটের ভেতরে ঢুকে গেলো।

ডেঞ্জারাস স্পোর্টস্ ও বক্সিং ইত্যাদির মহিমা এখন বেশ বুঝতে পারছি। সুখে থাকতে ভূতের কিল খেতে কেন যে এলাম! ভাবতে ভাবতেই আরেকটি লাফ! আমি চোখ বুজে ফেলেছি, হাড় গোড় আর আস্তো থাকছে না ভেবে। পাশে স্বামীজী খুবই উপভোগ করছেন আর পেছনে সাদা ছেলেরা। আবার আমিই একমাত্র নারী। তাই নারীদের লাজ বাঁচাতে আমাকে একটু সাহস সঞ্চয় করতেই হল! একজন আমাকে বললো : আর ইউ স্কেয়ার্ড! মিন মিন করে কি বললাম নিজেও জানিনা! এমন সময় পাশ দিয়ে চলে গেলো একটি বিশালাকৃতির জাহাজ। তার ঢেউয়ের ধাক্কায় আমরা কূপোকাৎ। চালক বললেন : আবহাওয়া ভালো নয় সমুদ্রের কাজেই এবার ফিরতে হবে। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম।

পাড়ে আসতেই জানালেন : এটা ওর নিজস্ব বোট। আমরা যেন বন্ধুদের এই নৌকো অভিযানে আসতে বলি। হেসে বললাম : প্রায় মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসলাম কাজেই বন্ধুদের নয় শত্রুদের রেকমেন্ড করবো !

হা হা হা : দরাজ দিল হাসি। এইভাবে হাসতে পারেন বলেই হয়ত প্রতি দিন চালাতে পারেন অপ্রতিরোধ্য স্পীড বোট, ভয়াল সমুদ্র গহ্বরে।

ল্যাভেন্ডার লালিত্য থেকে গাঢ় লালিমায়

ল্যাভেন্ডার ক্ষেত আগে কোনদিন দেখিনি । এবার দেখবো । যাবার আগে গেলাম ওয়েরেবি চিড়িয়াখানা দেখতে । ওখানে গোরিলা আছে । সেদিন ছিলো ভীষণ গরম । রোদের তাপে প্রাণ হাঁসফাঁস করছে । মেলবোর্নে সাধারণত: একটু গরম পড়লে বৃষ্টি হয়ে শীতল হয়ে যায় দেখেছি কিন্তু এবার যেন অন্যরকম । তবুও প্রচন্ড তাপে তেতে ওঠা ধরণীর কোল ঘেঁষেই গেলাম চিড়িয়াখানাতে । ওদের থিম অ্যাফ্রিকা । তাই একদল কালো মানুষ তাঁদের ঢোল ঢাক নিয়েই মজুত সবুজ সবুজ গাছের নিচে ।

অ্যাফ্রিকান ভাষায় গান চলছে । বিচিত্র তাঁদের পোশাক । রং চঙে পুঁথির মালা হাতে ও গলায় । সমবেত পথচারীরা একযোগে গান গাইছেন ওঁদের সাথে ।

আমরাও দাঁড়ালাম । শুনলাম অন্যরকমের গান যা প্রাণ ছোঁয়া । ভাষা বিন্দুবিসর্গ না বুঝলেও সুরের মূর্ছনায় দোলে হৃদয় । হাত পা নেড়ে নেচে কুঁদে চলেছেন এক দল মানুষ । আর অন্যপাশে গোরিলা ঘুম ভেঙে উঠে পাথরের ওপরে বসে হাই তুলছেন ।

তার ক্ষুদ্র পাহাড়ি কুটিরে তখন সূর্যের প্রখর তাপ । আবার হেঁটে ভেতরে ঢুকে গিয়ে কিছু একটা নিয়ে ফিরে আসছেন মাঠে । চারপাশে পরিখা কাটা । দেখে মনে হয় অন্যমানুষ । আমাদের দিকে একবার কটাক্ষ হানলেন । খোদ অ্যাফ্রিকা না হলেও অস্ট্রেলিয়াতেও বেশ । রসে বশেই আছেন মনে হল ।

অসাধারণ এই চিড়িয়াখানা ঘুরে গেলাম ল্যাভেন্ডার ক্ষেতে । অনেক দূরে । প্রায় ১৫০/২০০ কিলোমিটার । পথ ভারি সুন্দর । সবুজ বনানী, মাঠ ঘাট, সর্ষে ক্ষেতের সোনালী আভা মন ভালো করে দেয় । কোথাও কোথাও একটি মিষ্টি সুবাস ভেসে আসে বাতাসে । ডেলস্‌ফোর্ড থেকে আরো বেশ খানিকটা পথ ।

HEPBURN SPRINGS হল জায়গাটির নাম।

অসাধারণ বললেও খুব কম বলা হয়। এটি আদতে একটি ল্যাভেন্ডার ফার্ম নাম ল্যাভেন্ডুলা। সুইস্ ইতালীয় ফার্ম। পাহাড়ের ওপরে। সবুজ বনের কোল ঘেঁষে।

ঢুকতে হয় একটি ব্রিজ পেরিয়ে। তার পাশে অন্য একটি ঝোলানো ব্রিজ। নিচে কুলকুল ঝোরা। একমনে বয়ে চলেছে। ঝুলন্ত ব্রিজের ওপরে পা দিলেই ভয় লাগে।

ফার্মের দিকটি উঁচু। পাহাড়িয়া। গেট দিয়ে ঢুকলেই একটি দোকান। সাজানো আছে থরে থরে ল্যাভেন্ডার ফুলের গুচ্ছ ও নানাবিধ অর্গ্যানিক জিনিসপত্র। বিভিন্ন পারফিউম, ল্যাভেন্ডার তৈল, ক্রিম, হাতের কাজ, পোশাক সব দেখা গেলো।

দোকানের মধ্যে দিয়ে ঢুকে গেলাম অন্দরে। একজন গাইড আমাদের বলে দিলেন ঠিক কোথায় কোথায় যেতে হবে। হাত নেড়ে দেখিয়ে দিলেন। আমরা এগিয়ে গেলাম। দুই ঢালে অজস্র ল্যাভেন্ডার ফুটে আছে। বেগুনি আভা দেখে মনটা ভালো হয়ে গেলো। একটি সুন্দর গন্ধও নাকে এসে লাগলো। অনেক পর্যটক ফুল কুড়াতেই ব্যস্ত। বাগানে একটি আদিম বাড়ি দেখলাম। এই বাগিচার পুরাতন মালিকের বাসস্থান। সব কিছু সেইভাবেই সাজানো আছে। কাপ প্লেট বাসন পত্র। ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি। পুরনো কাঠের সোফা, খাট। একটি ছোটখাটো মিউজিয়াম বলা যায়। খুবই আকর্ষক। গেলাম আরো ভেতরে যেখানে ফুটে আছে কোটি কোটি ল্যাভেন্ডার। বেগুনি বনান্ত, পাহাড়ের ঢালে শুধুই বেগুনি রং লেগেছে।

ওরে ভাই বেগুনি লেগেছে বনে বনে - গেয়ে উঠি।

-রবীন্দ্রনাথের ল্যাভেন্ডার নিয়ে কোনো কবিতা আছে কি ?

জিজ্ঞেস করলেন আমার বাংলা না জানা স্বামী।

রবীন্দ্র মূর্খ আমি। জীবনে কটা রবীন্দ্র কাব্য পড়েছি হাতে গোনা যায়। বলতে পারলাম না তাই। কাফেতে অদ্ভুত খাবার খেলাম। সাথে ল্যাভেন্ডারের সরবৎ। বেশ কড়া গন্ধ। হয়ত কসমেটিকের ক্ষেত্রে ভালো, খাদ্যের জন্য নয়। হোম মেড কেক খেলাম। তাতেও ল্যাভেন্ডারের স্পর্শ। অনতিদূরে বৌদ্ধ্য গুম্ফা। কিছুটা কৃত্রিম মনে হয় এই পরিবেশে। বেগুনি বেগুনি এই অরণ্য ছেড়ে গেলাম একটু দূরে। বিশেষ কোনো ব্যাট তৈরি হয়েছিলো সেই অঞ্চলে। আন্তর্জালে যা পেলাম :

The hamlet of Shepherds Flat, several hilly kilometres past Hepburn Springs, has been home to five generations of the Tinetti family. This small township has a unique connection with Australian cricket.

Records dating back to the goldrush days show that the colonial sport of cricket was played intermittently on Tinetti's hill. The cricketing connection was firmly entrenched by the Crockett family just after the turn of the century. It began with the 1902 MCG Test Match between Australia and England. Test umpire Robert Crockett and English captain Archie MacLaren were casually chatting during a break in play. MacLaren was surprised that Australia did not cultivate its own bat willow and Crockett idly suggested that MacLaren should send some cuttings to Australia upon his return to the mother country.

Six months later the cuttings arrived sealed in a steel tube, but only one survived the heat of the equator. Crockett rushed this precious cutting to Shepherds Flat where it was nurtured by his younger brother James. From this single cutting grew thousands of willow trees at Shepherds Flat and the Crockett brand of bats became a household name amongst cricketers.

Australian cricketing greats Warwick Armstrong, Lindsay Hassett and Norman O'Neill all wielded the Crockett willow to great effect. In the 1960s the firm of R.M. Crockett & Son came under the control of the Slazenger Dunlop Group. The trees at Shepherds Flat were felled, except for a handful along the banks of the Jim Crow Creek that were saved by Aquilino Tinetti.

Aquilino Tinetti had a dream that one day Australian cricket bats would again be produced at Shepherds Flat. In recent years the Tinetti family have set about bringing this dream to fruition. They have been busy propagating and planting and the Shepherds Flat landscape is once again dotted with willow trees.

In 1999 the Tinetti family created Cricket Willow to share this unique story with others. Plenty of hard work transformed the rocky front paddock into a picturesque oval, complete with picket fence. The Pavilion is a recreation of the Shepherds Flat General Store and houses a museum, licensed café and billiard hall. A little further around the boundary is the Backward Point Bunkhouse and the Willow Grove. The boccé court is a tribute to the Tinetti's Swiss-Italian heritage and the training net with bowling machine gives youngsters a chance to hone their skills.

Further developments continue to evolve at Cricket Willow. The Tinetti bat factory has been recently refurbished and cricket bats are again being crafted by hand and eye at Shepherds Flat. Visitors can now tour the Cricket Gallery and witness the fascinating process from 'bud to bat'. :

This english Content from Internet . Just to avoid any misrepresentation I have not translated it in bengali.

ল্যাভেন্ডার ক্ষেত পরিদর্শন সেরে গেলাম লিলিডেলের লালিমায় । লিলিডেল নামটি ভারি মিষ্টি । আমার বাড়ির কাছে আছে একটি চিকেন কাফে । শুধু চিকেনের নানা পদ পাওয়া যায় । সেখানে শুধু লিলিডেলের চিকেন ব্যবহৃত হয় । অনেকদিন ধরেই ইচ্ছে এই লিলিডেলে যাবার । সুযোগ এসেও গেলো । আমরা খুব লং ড্রাইভ করি । কাজেই হেপ্‌বার্ন প্রিংস থেকে লিলিডেল বহুদুর হলেও আমাদের মজা । শুধু বৃদ্ধা মায়ের একটু কষ্ট হবে হয়ত । উনি এসেছেন এখানে সোজা আমেরিকা ঘুরে । লং লং জার্নি । কলকাতা থেকে আমেরিকা হয়ে -----

লিলিডেল হতাশ করলো । সাজানো ছোট শহর । অন্যসব অস্ট্রলিয়ার শহরের মতন । আমার প্রিয় স্থান বেজ-ওয়াটার পেরিয়ে যেতে হয় বলে আরো ভালো লাগে । দূরে দেখা যায় পাহাড়ের সারি । উঁচু নিচু রাস্তা, মোলায়েম । দৃষ্টিনন্দন কৃত্রিম বাগিচা দুইপাশে । ধীরে ধীরে পৌছে গেলাম লিলিডেল । চিকেন ফার্ম একটিও নেই । হয়ত অন্য কোথাও যা আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়নি । দেখলাম একটি বিশাল লেক । ঢালু দুই পাড় । পিকনিক করছেন এই খ্রীস্টমাসের পর্যটক । কেউ কেউ এসেছেন ব্রিসবেন অথবা ডারউইন থেকে । কেউ ক্যারাভেন নিয়ে এসেছেন কেউবা বিমানে । সপরিবারে ঘুরছেন লেকের ধারে । ক্যারাভেনে রান্না করছেন ও বাইরে এসে দেখলাম বিতরণে ব্যস্ত । চেয়ার পেতে বসে পোলাপানেরা, মাংস জাতীয় কিছু ভক্ষণ করছেন ।

লেকের পাড়ে মজার দৃশ্য । লেকে অজস্র ছোট ছোট নৌকা ভাসছে । খেলনা নৌকার মতন । অথচ কেউ কাউকে ধাক্‌কা মারছে না । অবাক কান্ড !

দেখলাম রিমোট হাতে নিয়ে লোকেরা বসে আছেন পাড়ে । আদতে তাঁরাই চালনা করছেন নৌকাগুলি । খুবই মজা লাগলো দেখে । এরকম জিনিস আগে কোনদিন দেখিনি কিনা !

টয়বোট। পাল তোলা কিংবা না তোলা বিবিধ তরণী। তটিনী নয় লেকই সই।

বাতাসের প্রকোপে গতিময় জলযান মাধুরি ঝরায়।

লিলিডেলে এইটুকুই আনন্দ দিলো। বাকিসব করে রব, একই সুরে যার নাম ভাঙা রেকর্ড।

মাইশোরের মুক্তকেশে

ব্যাঙ্গালোরে বহুদিন ছিলাম তবুও মাইশোরের মুক্তকেশে থাকিনি। বহুবার মাইশোরে থেমে খেয়েছি। মাইশোর হয়ে গেছি কিন্তু ঐতিহাসিক এই শহরে কখনো থাকিনি।

আমার ব্যাক্তিগত পরিচয় ছিলো মাইশোরের রাজার সভা পন্ডিত, বেদজ্ঞ পন্ডিতের সাথে। ওঁনার বই দক্ষিণ ভারতে এম এ ফিলোসফিতে পড়ানো হয়।

আগে সম্ভবত: কেম্ব্রিজে অধ্যাপনা করতেন।

মাইশোরে বিখ্যত দসেরার সময় রাজ নিমন্ত্রণ পেতেন। অনেক গল্প শুনেছি মাইশোরের কিন্তু কখনো থাকা হয়নি। শুনেছি মাইশোরের রাজা হ্যারল্ড রবিন্স পড়তেন। আমাদের স্কুলে লুকিয়ে লাইব্রেরি থেকে হ্যারল্ড রবিন্স ও সিডনি শেলডন নিয়ে পড়তেন দিদিরা। মাইশোরের রাজার এই গল্প শুনে বেশ মজা পেলাম। মাইশোর হয়ে গিয়েছিলাম বন্দীপুর ফরেস্ট। ওখানে মাইশোরের এক রাজকুমারীর একটি বনবাংলো আছে। সেখানে ছিলাম। সন্ধ্যার পরে ঘরের বাইরে যাবার নিয়ম নেই। কারণ বন্যশূকর ক্যাম্পাসের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। রাতে খেতে গেলে কিংবা ওয়াইল্ড লাইফ শো দেখতে গেলে বাংলোর কর্মচারিদের বলে যেতে হয়। ওরা টর্চ ও লাঠি নিয়ে পৌছে দেয় ঘরে কিংবা গন্তব্যে।

একটি খঞ্জ শূকরকে দেখেছিলাম। অন্যজনের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে একটি পা হারিয়েছে। ঘষে ঘষে চলেছে।

একবার স্থির করলাম নাহ্ এবার মাইশোরে যেতেই হবে। কর্ত্তাকে বলতেই উনি বুকিং করলেন একটি হোটেলে। টাটাদের হোটেল। নিরামিষ। এখন আমি নিরামিষ খেতে পারি। তখন পারতাম না। মানে শুধু নিরামিষ খেয়ে পেট ভরতো না। খুব ভুগেছিলাম। হোটেল তিনতারা। সেরকমই লেখা দেখলাম শ্বেত শুভ্র ফলকে।

পাশেই মাইশোর পুলিশ কমিশনারের বাংলো । অফিসার বাগানে বসে সপরিবারে চা পান করছেন, দেখা যেতো আমাদের জানালা দিয়ে ।

মাইশোরে আসার সময় রামনগারা হয়ে এসেছিলাম । এখানেই বিখ্যত শোলে সিনেমার শুটিং হয়েছিলো । সেই বড় বড় পাথরগুলি সব রয়েছে । সুসজ্জিত ।

প্রকৃতি সাজিয়ে রেখেছেন । আরে ও সাম্ভা ! বলে যেন ডেকে উঠলো গব্বর সিং ।

সিল্কের জন্য এই শহর বিখ্যাত । এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহৎ ককুন মার্কেট এটাই ।

মাইশোর সিল্কের উপাদানো এখানেই মেলে । একে বলা হয় সিল্ক টাউন বা সিটি ।

আগে বাঘ দেখা যেতো তবে ইদানিং শুধু স্লথ বিয়ার, নানান জাতের পাখি ও বিশেষ প্রজাতির শকুনের দেখা মেলে ।

শহরটা খুব ছোট । ডেভিড লিনের প্যাসেজ টু ইন্ডিয়ার শুটিং ও এখানে হয়েছিলো ।

বহু বড় বড় গ্রানাইট রক আছে । দৃষ্টিনন্দন ।

কৈশোরে ভাবতাম শোলের শুটিং হয়েছে মধ্যপ্রদেশে । কারণ ঐ রাজ্যই তো ডাকাতির জন্য প্রসিদ্ধ । অনেক পরে জেনেছি যে শুটিং হয়েছে কর্ণাটকে ।

একদিন দেখলাম মাইশোর রাজবাড়ি । খুব খ্যাতি শুনেছিলাম । আমার মন ভরাতে পারলো না । জাঁক জমক পূর্ণ ও রাজকীয় সন্দেহ নেই কিন্তু সুক্ষ্মতার অভাব চোখে পড়ে । রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ দেখার পরে এই প্রাসাদ শুধুই চোখের পীড়া দেয় ।

শৈল্পিক ছোঁয়া নেই । গোদা গোদা মোটা দাগের ভাস্কর্য । এর চেয়ে হাম্পি (বিজয়নগর রাজ্য) অনেক সুন্দর । অনেকে বলেন হাম্পি নাম হয়েছে পম্পা

থেকে। পম্পা হল তুঙ্গভদ্রা নদীর আদি নাম। এই সভ্যতা তুঙ্গভদ্রার তীরে। অনেকে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যার সাথে এর মিল পান। বলেন : এই সেই বানর রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যা।

ওদিকে বাদামির নাম হয়েছে বাদামের মতন রঙের পাথরের কারুকার্যের জন্য। দানব বাতাপি ও অগস্ত্য মুণির গল্প আছে পুরাণে। অনেকে মনে করেন বাদামি সেই বাতাপির নামে নাম হয়েছে। চালুক্য বংশের সভ্যতা এই বাদামি। অপরূপা। নারায়ণ সান্যালের বই আছে কিনা জানিনা। ওঁনার কন্যা অনিন্দিতা (বসু) দিকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

মাইশোরের রাজপ্রাসাদ আমার কাছে শিরোনাম পাবে : মধ্যমেধার ভাস্কর্য – হিসেবে। আরো অদ্ভুত ব্যাপার হল : এই বংশের রাজা ও তার সমস্ত আত্মীয় পরিজনকেই প্রায় একরকম দেখতে। যেন কয়েকটি ছাঁচ তৈরি করে বিভিন্ন নারী ও পুরুষের মুখে ফিট করে দেওয়া হয়েছে।

চামুন্ডি হিলসে গেলাম। শহর থেকে ১৩ কিমি দূরে। অপূর্ব রাস্তা, সবুজের সারি দুইদিকে। পথে বেয়ে উঠে যাও পাহাড়ে। মাইশোরের দৈত্য ছিলো মহিষাসুর। তাকে মেরে দেবী চামুন্ডা / চামুন্ডেশ্বরি /মহিষাসুর মর্দিনী অবসান করেন একধারার যার নাম হিংসা। এই দেবী পুজিতা চামুন্ডেশ্বরি মন্দিরে। মাইশোরের রাজা কৃষ্ণরাজ ওয়াদিয়ারের কূল মন্দির এটি। এখানে দশেরার সময় উৎসব হয়।

এখান থেকে ললিতা মহল প্যালেস পরিষ্কার দেখা যায়। আমার এক বান্ধবী বলছিলো যে ও কোথায় পড়েছে যে এই মন্দির বিজয়নগরের রাজা বিষ্ণুবর্ধনের তৈরি। উনি এই মন্দির মাইশোরের ওয়াদিয়ার বংশকে উপহার দেন। এই দেবী নাকি মাইশোরের রাজপরিবারকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করেন। এরকম বহু গল্প গাথা শোনা যায়।

মন্দিরে ঢুকলাম স্পেশাল টিকিট কেটে। অপেক্ষমান যাত্রীদের বিরক্ত করছে বানর। হাত থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে পুজোর থালো। প্রসাদ।

দেবী অপরূপা নন। ভয়াল সুন্দর। লোল জিহ্বা, মুন্ডমালিনী কালীর মতনই কালের সীমানায় দন্ডায়মান।

পুজো দিলাম। প্রসাদ পেলাম।

বহু সাহেব/মেম লাইনে দাঁড়িয়ে পুজো দেবেন বলে। জানিনা বিধর্মী বলে বাধ সাধবেন কিনা কতৃপক্ষ। একজন বললেন : আমি ইস্কনের সদস্য। আরেকজন বললেন : আমি আর্য সমাজ।

আর আমি ?? আমার কোনো জাত নেই, কূল শীল নেই, উপাধি নেই। ধর্ম নেই। আমি মহাজাগতিক চেতনার এক বিন্দু মাত্র -টাইম ও স্পেসে লিমিটেড।

মাইশোরে এই মন্দিরটিই আনন্দ দিলো। গাড়ি নিয়ে ওপরে ওঠা যায়। সিঁড়ি ভাঙতে হয়না।

প্রখ্যাত মাইশোর দোসা খেতে খেতে বৃন্দাবনের ডান্সিং ফাউন্টেন দেখতে গেলেও দেখা গেলো অস্তরাগের আলোয় তা বন্ধ হয়ে গেছে। শোনা গেলো কি সব মেন্টেনেন্সের কাজ চলছে।

তাই দেখা হলনা দু চোখ মেলিয়া, ঘর হতে অনেক পা ফেলিয়া

একটি কৃত্রিম ঝোরার মাথায় দুইটি মুক্তো বিন্দু।

হ্যাঙ্গিং রক

ভিক্টরিয়া প্রদেশের একটি ধারে ছোট্ট জনবসতি উডএন্ড । যার অর্থ করা যায় বনের সমাপ্তি । সেই জনপদের কাছেই আছে বা বলা ভালো এই জনপদ সেই ঝুলন্ত পাথরের ছায়ায় ছায়ায় রয়েছে । জোয়ান লিন্ডসের নভেল পিকনিক অ্যাট হ্যাঙ্গিং রক এর রসদ এই পাথরের লুকানো রয়েছে । ১৯০০ সনে তিনজন স্কুল ছাত্রীর অন্তর্ধান রহস্যকে কেন্দ্র করে এই নভেল যার চলচ্চিত্রায়ন হয়েছে পরে ।

পাথরটি রহস্য মোড়া । রং মেটে । আগ্নেয়শিলা । অদ্ভুত আকৃতি । যেন স্লেটের মতন কিছু পাথর একের পর এক শেঁটে দেওয়া হয়েছে । আমরা উডএন্ডে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে গেলাম এই শিলার কাছে । ঠান্ডা বাতাস ও ফুলের সুবাস মনে নেশা ধরায় । সঙ্গে রহস্য । কুয়াশা । ধোঁয়া ধোঁয়া ধোঁয়া । জানা গেলো মাত্র ৫০ মিনিট হাঁটলে দেখে ফেলা যাবে শিলার বিন্যাস ।

আমি মাত্র ২০ মিনিট পেরেছি । আমার হাড় মড়মড়ানি ব্যামো হয়েছে ! মাসেল উইকনেস আজ প্রায় ১২ বছর ধরে । আর আছে ফ্ল্যাট ফুট । তাই সোজা রাস্তায় বেশি হাঁটা সম্ভব হয়না । তবে ট্রেডমিল করতে অসুবিধা হয়না । আছে একটি কাফে । সুস্বাদু খানা মেলে ।

পাথরের বিভিন্ন স্থানে নামগুলি খোদাই করা কিনা জানিনা তবে শুনলাম যা তাতে মনে হল এ জিনিস মনে না রাখতে পারার কোনো কারণ নেই ।

নাম :: the Chapel, Black Hole of Calcutta, Flying Saucer, Vampire Cliff, Lover's Leap ---

৬.২৫ মিলিয়ন বছরের পুরনো এই শিলা আজ ঘোড় দৌড়ের স্থান, উইকএন্ডের দর্শনীয় স্থান ও নানাবিধ গাছগাছালির সমাবেশ । অপরূপ এই স্থানে গেলেই মন ভালো হয়ে যায় ।

উডএন্ডের পথটি ভারি মনোরম । গেছে বেঁকে কোথায় কে জানে ---

প্রতিটি ভাঁজে সবুজের হাতছানি। ঘন অরণ্য। বিপজ্জনক খাদ। মানুষের একলা মিছিল। নির্জন ভৌতিক কুটির। ভাঙা ভাঙা পাথরের দেওয়াল, পরিত্যক্ত লাল ইনফর্মেশান সেন্টার, মধ্যযুগীয় পাব, হ্রেষাধ্বনি ও ক্ষয়াটে বৃক্ষ। ইংলিশ টাউনের ফেলে আসা ছায়ায় ক্ষুদ্র জনপদ। মাউন্ট ম্যাসাডনের এলাকায় এই জনপদ বলে অনেক ওয়াইন ক্ষেত আছে। এক পথচারী দরাজ দিল। আমাদের অফার করলেন : আমার বাগানের সুরা, পান করুন না ! ঝুলন্ত শিলায় ভৌতিক অবয়ব। কাছে আসতেই বোঝা গেলো এরা চীনা মানুষ। নিজেদের ভাষায় বকবক করতে করতে চলেছেন। হাতে ধরা বিয়ারের ক্যান।

এই বনভূমে কিছুটা মাদকতা জাগেই। ইচ্ছে হয় নিষিদ্ধ সম্পর্কে ভেসে যেতে। কাউকে যদি ভালোলাগে কিন্তু না পাওয়ার সম্ভবনা থাকে অথবা পরকিয়ার পটভূমি হতেই পারে হ্যাঙ্গিং রকের অবছায়া ! প্রেমাস্পদকে বলতে ইচ্ছে হয় গহীন বনভূমে : আই ডিজায়ার ইউ, কিস মি ! পাথরের বাঁকে বাঁকে রোমান্সের হাতছানি। মনের স্বাদ মেটে না যেন। প্রতিবারই মনে হয় নতুন আলো, রং, মৌতাত। মহুয়ার নেশা। বিখ্যাত সিনেমার দৌলতে অনেক পর্যটক এখানে আসতে আরম্ভ করেন ও এই এলাকা অস্ট্রেলিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত হয়। আজও মানুষ আসেন দলবেঁধে, কুহেলির সন্ধানে। সেই ছাত্রীর দলটিকে আজও পাওয়া যায়নি, নাহ্ হন্টেড থ্রিডি নামক বলিউডী মুভির মতন টাইম মেশিনে চড়ে পিছিয়ে গিয়েও না ! আমাকে বললেন আলাদিন, এই এলাকার এক রেস্তোরাঁ কর্মী : ডোন্ট গো দেয়ার, দ্যাট সাইড ইজ স্পুকি। তাই তো আমি দেবদারুর ছায়ায় ছায়ায় ঘুরলাম। ভয়ে। পতিদেব তখন পাথরের অনেক ওপরে।

মনে মনে কল্পনা করছিলাম কী হতে পারে সেই ছাত্রীদের পরিণতি ! ওদের ব্যাথা, কষ্ট অনুভব করার চেষ্টা করছি এমন সময় হঠাৎ চীৎকার ! কর্কশ স্বরের এই ডাকে ভয়ার্ত আমি জড়িয়ে ধরি লিন্ডাকে, যাঁকে আমি চিনিও না ! উনি বলেন : ভয় পেয়ো না । দিনের বেলায় এত লোকের মাঝে কিছু হয়না । একটু দূরেই এক দঙ্গল শিশু খেলছে । তারা কিন্তু ভয় পায় নি । তাই একটু লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে ঢুকে পড়লাম পাশের কফি শপে হয়ত লাজে রাঙা মুখটা ঢাকতে ।।

বাদামী পাহাড় ও প্রিয় ঘোড়াগুলি

নীলাঞ্জন সমাভাষম রবিপুত্রম যমাগ্রজম
ছায়ামার্তন্ড সম্ভুতম্ তম নমামী শনি স্মরম।

শনিদেবের মন্ত্র। মন্ত্রটা সুন্দর না ?? বলে ওঠেন আমার পার্শ্বচর। এসেছি বেড়াতে কিলমোরে। মেলবোর্ন থেকে বেশ দূরে। আইরিশ ও স্কটিশদের জায়গা। আইরিশ বেশি। অলস মানুষ, প্রাগৈতিহাসিক শহর। ফিরতে ফিরতে আলো ঝরে যায়। আকাশে শনিদেব তাঁর রহস্যময় বলয় নিয়েই !

ইন্‌ফাইনাইট আমাকে আকর্ষণ করে। রাতের তারামোড়া আকাশ হাতছানি দেয়। এখন শনির দশা চলেছে আমার তাই এই মন্ত্রের খুব ভক্ত হয়ে পড়েছি। -- উনি কোনো পাপীকে ছাড়েন না !

অনেক দূরে এমনিতেই, আমরা আরো ঘুরে এসেছি বলে অনেক লম্বা সফর। আসলে উডএন্ড দিয়েও যাওয়া যায়। ওদিকের পথটি ভারি সুন্দর। বনানীর কোল ঘেঁষে লম্বা ড্রাইভ। পাহাড়ময় বাদামী ও সাদা ঘোড়া। কারো কারো গায়ে জামা পরানো। সীমাহীন ক্ষেতখামার। ওখানে অশ্ব বিষ্ঠা বিক্রি হয়। লোকে কিনে নিয়ে যান। মাঠে পড়ে আছে অনাদরে, দেখা গেলো। কিছুটা প্যাকেটে করে রাখা। এছাড়া মাঠের পরিত্যক্ত সমস্ত ঘাসের চাদর মুড়ে রাখা। যেমন আমরা মাদুর মুড়ে রাখি ঠিক সেরকম।

রোল করে সার বেঁধে রাখা মাঠে ঘাস গুলি। সবুজ শুকনো ধরণের। আর ঘোড়ার খুড়ের শব্দ ! ট্‌গবগ টগবগ ---

রাশি রাশি ঘোড়া। অশ্বারোহী পর্বত ! যেন ঘোড়া পিঠে চড়ে ছুটছে পাহাড়। ঐ বুঝি এলো বীরপুঙ্গব ! পক্ষীরাজের চড়ে।

গিসবোর্ন থেকে রাস্তা ঘোড়াময়। আগে পুরনো বাড়ির সারি, ফুলবন, পরিত্যক্ত পানশালা, সপ্তাহান্তের ফার্মাস মার্কেট যেখানে লোকাল মানুষ নিজেদের ক্ষেতে চাষ হওয়া সবজি, ফল, ফুল ইত্যাদি নিয়ে এসে

বিকিকিনি সারেন । কিলমোরের বেশিরভাগ বাড়ি জানাগেলো ব্লুস্টোন দিয়ে তৈরি অর্থাৎ ব্যাসাল্ট রক ।

আমরা বসলাম একটি ছোট রেস্তোরাঁয় । বাড়ির তৈরি খাবার মেলে এখানে । খুব সুস্বাদু ।

পেছনে নানবিধ ফুলের চাষ করেছে । মালিক সবাইকে হাত ভরে ভরে ফুল দিচ্ছেন । নাও আরো ফুল নাও ! এই নাও, হাত ভরে নাও, মন ভরে নাও !

ফুল দিয়ে খেললাম হোরি । এই শীতের মরসুমেও । একজন আরেকজনকে ফুল দিয়ে মারছি । ভরিয়ে দিচ্ছি ফুলে ফুলে চরাচর ! দারুণ অভিজ্ঞতা । একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁ আছে মূলত সেখানেই খেতে গিয়েছিলাম । জানা গেলো দিনের বেলায় লোক কম হওয়ায় খাবার দেওয়া বন্ধ করেছে, রাতে দেয় ।

ছবি দেখে মনে হল ভালই খেতে হবে !

ঘুমন্ত শহর কিলমোর । সাহেবরাও আমাদেরই মতন মানুষ । হাসে কাঁদে । দলবেঁধে শহরের মধ্যস্থলে খেলছেন ফুটি । ওরা শুধু একটু মুক্তমনা ।

তাইতো দেখলাম একটি পরিবারকে যাঁরা তিন স্বামী ও দুই স্ত্রী মিলে এসেছেন । একজন অবশ্যই কমন কাপেল ছিলেন যারা আগে দম্পতি ছিলেন । এখন বাকিরা তাদের সাথী বা প্রাক্তন সাথী । গাদাখানেক বাচ্চা নিয়ে এলাহি ব্যাপার । ভারতীয় বেশি চোখে পড়লো না ।

পোস্ট অফিস, কোর্ট ও পুলিশ ব্যারাক তৈরি হয়েছে ১৮৬৩/৬৪ ও ১৮৯২ সনে । যদিও ১৮৯৪ সনে তৈরি টাউন হল সবচেয়ে আকর্ষক । প্রচুর সুদৃশ্য পিলার রয়েছে । সবচেয়ে পুরাতন বাড়ি হুইট্‌বার্গ কটেজ । ১৮৫৩ তে বানানো । এখন যাদুঘর । ১৯ সেঞ্চুরির জিনিসপত্র আছে । আমরা দেখিনি ।

মনুমেন্ট হিল একটু দূরে। সবুজের রাজ্য এই সুউচ্চ স্থান থেকে দেখা যাবে কিলমোর শহর। একজন বললেন। চারপাশেই তো পাহাড়। তাই ভাবলাম একবার ঘুরেই যাই। কিন্তু যাওয়া গেলোনা। পথে ভাঙাচোরা রাস্তা। বোর্ড : সাবধান। তাই ঘুরে গেলাম গিসবোর্ন।

আমাদের সম্প্রতি গাড়ি দুর্ঘটনা হয়েছে। গাড়ি রাইট অফ করে দেওয়া হয়েছে। একরাত আমি হাসপাতালেও ছিলাম। নতুন গাড়ি কিনেছিলাম এখানে এসে। সেকেন্ড হ্যান্ড নয়। পেছন থেকে এসে ধাক্কা মারে এক বুড়ি যার পা নেই। বয়স আশির ওপরে। ইন্সুরেন্স কোম্পানিকে মিথ্যে বলায় ওর লাইসেন্স কেড়ে নিয়েছে পুলিশ। এমনভাবে ধাক্কা মেরেছে যে পর পর চারটি গাড়ি রাইট অফ হয়ে গেছে। আমাদেরটা খুব বাজে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এবার একটি লাক্সারি কার কিনেছি। আমাদের এক বন্ধু বি এম ডাবলু কিনেছে। নতুন। আমরাও কিনতে পারতাম। শুধু জানতাম না আগে যে একই টাকায় বি এম ডাবলু-র ঐ মডেল পাওয়া যেতো ! পয়সা কামাও, ভোগ করো, আন্ডার প্রিভিলেজদের দাও। অ্যাঞ্জেলিনা জলির মতন।

আমার খুব সিম্পেল হিসেব। কমিউনিস্ট হবার খুব প্রয়োজন আছে কি ? মানবদরদী হও, কমিউনিস্ট নৈব নৈব চ ! হিপোক্রিটদের আমি অপছন্দ করি।

কিলমোর শহরটা খুব শান্ত। মানুষগুলো গোলাপী। কমলা। হলুদ। সরল চোখের চাউনি। মিষ্টি ব্যবহার।

জীবন এখানে এখনও আকরিক। একটি সরু ব্রিজ পেরিয়ে গেলাম এক নিষিদ্ধ এলাকায়।

সেখানে সার দিয়ে বসে প্রেমিক প্রেমিকা। জলকেলি করছেন। পাশেই ছোট ঝোরা।

তুর্কি, আফগানিস্তানের হানাহানি, রক্তারক্তি, বোম ব্লাস্ট, লড়াই এর অন্যপাড়ে কিলমোর।

এখানে হাসে হেমন্ত । হেমন্তের বিষ বলে কিছু নেই । প্রাকৃতিক বিবরে শুধুই হাসির হিল্লোল আর জীবনের কল্লোল ।

বয়স্ক মেমরা হেঁটে যাচ্ছেন বাজার সেরে একমনে । হাতে ধরা ফুলের ঝাড় । আমাকে দেখে একটু হাসলেন :

ওহ্ ইন্ডিয়া ? আমি গিয়েছি, আমার মা দক্ষিণী । মাদ্রাজে বাড়ি । ওহ্ হো ওটা তো এখন চেন্নাই !

মা এখানেই থাকেন একটু দূরে । বাবা গত হয়েছেন ।

পথচারী মানুষ আমার বন্ধু । কলকাতায় এক লরিওয়ালা আমার বন্ধু ছিলো । পাঞ্জাবী । আর আমি ডাল ফোড়ন দিতে শিখেছি এক ফুটবাসীকে দেখে । ফুটপাথে বসে ফুটো আভিজাত্য ছেড়ে এত সুন্দরভাবে সে ডাল ফোড়ন দিলো যে আমার মনে ধরে যায় । আমিও এখন ঐভাবেই দি-ই ।

প্রতিটি মানুষ শেখাতে পারেন । প্রয়োজন শুধু একটি পরিচ্ছন্ন মনের যা মানুষকে কাঁটাছেড়া করবে না ।

নিজের লুপ্ত অতীতের কালিমা ভুলে অন্যকে কলোনির ছোটলোক বলে নিচু করার চেষ্টায় ব্রতী হবেন না ।

আমাদের বাড়ির কাছেই শপিং মল । একটি বৃদ্ধ মানুষ বসে বসে গীটার বাজিয়ে গান করেন । স্যাম । আমি ওঁকে পয়সা দিই যখন পারি । একদিন আমাকে দিলেন একটি ওষুধ । আসলে ভেষজ তেল । ওঁর বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছেন । বললেন : এটা লাগিও মাথা ব্যাথা সেরে যাবে ।

সত্যি গিয়েছিলো । বললাম : তোমার বাড়ি থাকতে এখানে রাস্তায় থাকো কেন ?

বলেন : আমি আসলে এই জীবনটা এক্সপেরিয়েন্স করে দেখতে চাই । গান শুনিয়ে পয়সা পাই । কোনো কাজই ছোট নয় ! কাজ করতাম পোস্ট অফিসে । সেলসে ।

আর কালটিভেট করিনি ওঁকে। সব গল্প আমি শুনতে চাইনা।

কিলমোর থেকে এক ভদ্রমহিলা ৭০ কিলোমিটার ড্রাইভ করে রোজ মেলবোর্নে চাকরি করতে যান। কেন জিজ্ঞেস করাতে বললেন : ওখানে থাকতে পারবো না খুব কস্টলি।

বাড়িতে পঙ্গু স্বামী আছেন আর বিকলাংগ শিশু। আমিই ব্রেড উইনার।

ঝড় জলের সময় খুব অসুবিধে হয়।

এঁর ও কি শনির দশা আছে ? জানতে চাই।

কিলমোরে নিঝুম সন্ধ্যা কাঁপিয়ে বলে ওঠেন : প্ল্যানেট্স্ ? তার এফেক্ট মানুষের ওপরে ? ওহ্ রাবিশ !

বলি : এই মন্ত্রটা জপ করুন ভালো হবে।

নীলাঞ্জন সমাভাষম রবিপুত্রম যমাগ্রজম
ছায়ামার্তন্ড সম্ভুতম্ তম নমামী শনৈশ্চরম।

নীলা নীলা করে থেমে গেলেন। আকাশে তখন উজ্জ্বল নক্ষত্র। আমি সুদূরের পিয়াসী। বললাম : স্যাটার্ন তো পূজিত ভারতে। বলেন : ওহ্-রিয়েলি ? ইন্ডিয়া ইজ আ মিস্টিরিয়াস কান্ট্রি। দে ওয়ার্শিপ স্টার্স্।

ট্রিজ। অ্যানিম্যালস্।

বলি : ইন্ডিয়া গেছো ?

হেসে বলেন : হ্যাঁ। আই ওয়াজ আ ডিসাইপেল অফ শিরডি সাঁইবাবা। হি ইজ সাচ আ পাওয়ার্ফুল ম্যান !

কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে ঝর্ণা। একটু দূরে ঘোড়ার দল। নিজেদের মধ্যে আদর আহলাদ করছে।

আকাশের দিকে চেয়ে ভাবি : সত্যি জগৎ জুড়িয়া আছে এক জাতি ----

তাহলে এরই বা শনির দশা হবেনা কেন ? রুষ্ট হবেন না ছায়া মার্তন্ড - শনিদেব এই নীলনয়না, শ্বেতকপোতীর প্রতি কেন ?

অস্ট্রেলিয়ান বলে ??

তুহিনা

সফেদ বরফের হাতছানি, হিমেল হাওয়া, তুষার জুড়ে রঙের খেলা, অচেনা পশুর পদচিহ্ন এইসব নিয়েই মাউন্ট জেরিটিল্লা । ভিক্টোরিয়া স্টেটের উত্তরে এক অচিন শহরে এই পাহাড় । শীতকালে বরফ দিয়ে ঢাকা প্রান্তর । আমরা এসেছি ক্যাম্পিং-এ । আমি, আমার স্বামী ও গুটিকয়েক বন্ধু ।

মোটা ক্যাম্পের ভেতরে হিটার । তবুও হাড় কাঁপানো শীত । ফ্লাস্কে চা । বিস্কুট, চানাচুর । চারপাশে ধূ ধূ প্রান্তর । গাছের কোরক, পত্র চিহ্ন নেই । সবই বরফে সাদা । কোথাও কোথাও বরফ ঝুলে আছে ভাস্কর্যের আকারে । তাতে সোনা রঙা রোদ পড়ে এত সুন্দর বর্ণ ধারণ করেছে যে কোথাও সবুজ, কোথাও গাঢ় নীল আর কোথাও চেরি লাল লাগছে । মনে হচ্ছে কোনো শিল্পী তার নিপুন তুলিরেখায় এই চিত্র সৃষ্টি করেছেন ।

মেঘদূত --- আকাশে মেঘদূতের সারি । আজ আকাশ নীল । কাল সাঁঝে এখানে এসেছিলাম । তাঁবু গাড়তে গাড়তে ঘন নিশা । তাই বাইরেটা ভালো করে দেখা হয়নি । অনেকটা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পাহাড়ের চূড়ায় আতঙ্কের মতন সেট আপ শুধু ইয়েতী নেই ।

কফির ধূমায়িত কাপ হাতে তাঁবুর বাইরে ! সোনা রোদ পড়ে পাশের পাহাড়টা মায়াময় লাগছে । মিঠে স্বরে কে যেন গাইছে ! মনে হয় কোনো আদিবাসী যুবক । রঙ চঙে পোষাক পরা । হাতে অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র । ওরা পাহাড়ি গাইয়ের চর্বি খায় । তাতে নাকি দেহ উষ্ণ থাকে ।

আমরা অনেক ক্যানড্ সবজি ও ফল এনেছি । কিছু মাংসও । সকালে সবাই তাই দিয়ে প্রাত:রাশ সারলাম । তারপরে গরম জামাকাপড় চড়িয়ে গেলাম হাঁটতে ।

আশেপাশটা ঘুরে দেখলাম । সফেদ পথঘাট । ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে তুহিন কণা । সূর্যকিরণের আভায় দিগন্ত মোহময় । আকাশ আর পাহাড়ে

যেখানে কানাকানি সেদিকে এগিয়ে গেলাম । মনে হল কতনা অচেনা পাহাড়িয়া মানুষ ওখানে বসে তাদের জন্ম জন্মান্তরের সুখ দু:খের হিসেব নিকেষ করছে ।

এই সব পাহাড়ে কোনো মনাস্ট্রি নেই । কিন্তু নাহ্ একটি মনাস্ট্রি দেখা যাচ্ছে । অস্ট্রেলিয়ার পাহাড়ে মনাস্ট্রি ? বৌদ্ধ্য গুম্ফা ?

লামাও আছেন দুজন । এসেছেন তিব্বত থেকে । অনেকদিন ছিলেন ধর্মশালায় ।

ওদের সঙ্গে এক মহিলাকেও দেখা গেলো । গুম্ফায় রান্না বান্না করেন ও ধ্যানমগ্ন পাহাড়ে প্রাণের ছিটেফোটা দেখলে হেসে অভ্যর্থনা জানান ।

নাম কেশাং লিংপো । তিব্বতীদের নাম নাকি বংশ অনুসারে হয়না । ওরা যে কোনো নাম যা পছন্দসই সেটা গ্রহণ করতে পারেন । অনেকসময় ওদের পিরিচুয়াল গুরু অর্থাৎ কোনো লামা সেই নাম দেন । কেশাং ধর্মশালায় ছিলো । দলাই লামার সান্নিধ্যে । বল্লো : চৈনিকরা আমার পুরো পরিবারকে মেরে ফেলেছে । তাই আমি এখানে চলে এসেছি । সিডনি হয়ে এখানে । আগে সিডনিতে কাজ করেছি । তিব্বতী সংস্কৃতি শিক্ষাদানের কাজ করতাম ।

পাহাড়ে এবার কিছু কিছু করে জন্তু জানোয়ার দেখা যাচ্ছে । ঘুম ওড়না সরিয়ে এক এক করে ধাবিত হচ্ছে মানব সভ্যতার দিকে !

আলগা বরফ খুঁটে খাবার খাচ্ছে ।

একটি কুটির দেখা গেলো । আমরা অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি । একজন মানুষ একটি কুড়ুল নিয়ে বরফ এর চাঁই ভেঙে চলেছেন এক মনে । হয়ত ভেতরে প্রবেশ করতে চান । কিছু মানুষ ছবি তুললেন, সবি মোবাইল ক্যামে । এবার এগুলি যাবে ওয়েবক্যামে ☺

এত ঠান্ডায় একজন শিল্পীকে দেখা গেলো ছবি আঁকছেন । গরম পোষাক পরে আছেন তবুও মাঝে মাঝে হাত ঘষে নিচ্ছেন । কিছু গাড়ি যাচ্ছে এই

রাস্তা দিয়ে। ওর সজ্জিত পেন্টিং এর সারি কিনে নিচ্ছেন কেউ কেউ গাড়ি থামিয়ে।

সাদা ধবল বরফ এর মধ্যে একটি পান্না রংয়ের মহিলাকৃতি। আকৃতিটি বিমূর্ত। ছবিটা কিনবো ভাবছিলাম। বাড়িতে নিজের ছবি রাখারই জায়গা নেই। এখন গ্যারেজটা আমার স্টুডিও। আমাদের ডবল গ্যারেজ। একটিতে গাড়ি থাকে অন্যটায় আমার ছবি। কিছু ছবি সাজিয়ে রেখেছি ড্রয়িং রুমে।

ভাবলাম এটাও কিনে সাজাবো। কিন্তু অনেক দাম। বললেন : চড়া দামে রেখেছি কারণ এগুলি এখানে আনতেই খুব কষ্ট পোহাতে হয়। এই ছবি থেকে যা আয় হয় কিছুটা অনাথ শিশুদের চ্যারিটিতে যায়।

এটা শুনে আর থাকতে না পেরে কিনেই নিলাম।

অপূর্ব ছবি। সাদা ও সবুজ। দেখে মনে হয় ফটোগ্রাফ। এত নিখুত কাজ।

দুপুরে খেলাম বিরিয়ানি। আমিই রান্না করে এনেছিলাম। তবে এটা নিউট্রেলা (সয়াবিন) এর বিরিয়ানি।

কারণ আমাদের সাথে ছিলো এরশাদ ও স্টেফি। ওরা দুজনেই নিরামিষাশি।

ইস্কনের সদস্য। এখানে মেলবোর্নে একটি ইস্কনের মন্দির আছে আমার বাড়ি থেকে মাত্র ১৫ মিনিট। ওখানে ফ্রিতে উপাদেয় খানা মেলে। আমার স্টিভ জবসের কথা খুব মনে পড়ে তখন যে একটা সময় বিশ্বের প্রথম সারির ধনবান পুরুষ এই ইস্কনে খাবার খেতে যেতেন ফ্রিতে। কারণ তখন উনি ছিলেন দরিদ্র।

খুবই লোভনীয় সেই সব খাবার যদিও নিরামিষ।

আমিও নিরামিষ বিরিয়ানি নিয়ে বসলাম তাঁবুর ভেতরে। ভালই হয়েছিলো।

খাওয়া শেষে সবাই মিলে আগুন জ্বেলে বাইরে বসা হল । আড্ডা, গান, বেহালার সুর সব কিছুর মেলবন্ধন পরিবেশকে হাল্কা করে তোলে । মন অসম্ভব রিল্যাক্সড্ যা নগর জীবনে সহজে মেলেনা । বাইরের নিদারুণ শীতেও বেশ ভালোলাগছিলো ।

পরের দিন কেশাং আমাকে ফ্রিতে তিব্বতী মাসাজ দিলো । গরম ভেষজ তৈল, পবিত্র ঘন্টা ধ্বনি কানের কাছে এনে, মন্ত্র পড়ে হল মাসাজ । সত্যি বলতে কি খুবই আরামদায়ক সেই মাসাজ । খুব ভালো লাগলো । কিছু দিতে গেলে ও নিলো না । বললো : তোমাকে ভালোবেসে দিয়েছি ।

ভালোলাগলো । কে-ই বা এত ভালোবাসে আজকাল । স্পষ্টবাদীদের ভালোবাসার লোক বড় একটা পাওয়া যায়না এই জগতে । তাদের লোকে অপছন্দই করে । কেশাং সুদূর তিব্বত থেকে আমাকে ভালোবাসছে, হাত বাড়িয়ে মন ছড়িয়ে ! মন্দ কি ?

পরের দিন বরফের পাহাড়ে চড়া । বিশেষ জুতো পরে । এক কথায় পর্বতারোহণ ।

কখনো কখনো পড়ে যাচ্ছিলাম ।পা পিছলে । সাথে বিচক্ষণ গাইড ছিলেন । হাতটা ধরেই ফেলছিলেন । আমার স্বামী রক ক্লাইমবিং করে অভ্যাস আছে ওঁর অসুবিধে হচ্ছিল না। আমি ক্লিফ হ্যাঙ্গার নই তবুও মোটামুটি পারছিলাম ।

হিমালয়ের আকর্ষণ কে উপেক্ষা করতে পারিনা । তাই সব পাহাড়েই হিমালয় খুঁজি । তবুও এই পাহাড় অনন্য ।

রাতে গরম গরম আলু পরোটা ভাজলো স্টেফি । ও নিউজিল্যান্ডের মেয়ে । অনেকদিন মুম্বাইয়ে ছিলো । ব্যাটারি চালিত উনুন । সাথে আচার । তবে বিদেশী আচার । অজস্র আড্ডা । অচেনা জন্তুর ডাক । হাড়কাঁপানো শীত । হিমেল বাতাস । শুকনো তার পরশ । আগুনের পাশে আমরা কজন ।

শুধু বরফ দেখাও বোরিং । তাই এবার তাঁবুতে ঢুকে সিনেমা চালিয়ে বসলাম । সিলভেস্টার স্ট্যালোনের ক্লিফহ্যাঙ্গার । সম্প্রতি ওঁর পুত্র বিয়োগ হয়েছে ।

সেলিব্রেটেড্ পিতার হৃদয় ক্ষরিত হয়েছে এক সাধারণ পিতার মতনই । অভিনেতারাও মানুষ । বললো এরশাদ ।

এসব আলোচনা, টুকিটাকি কথায় কেটে গেলো সেদিনটাও । রাতে পাহাড়ি হায়না ডাকলো কাছেই । আগুন দেখে হয়ত এগোয় নি ।

নিজেকে বড় একা মনে হচ্ছে আজ । আদিমতা মানুষকে নিজের বিবেকের সামনাসামনি দাঁড় করিয়ে দেয় । নগ্ন নির্জনে জীবনের খাতা খুলে দেখছিলাম ঠিক সেই সময় দরজা ঠক্ঠক্ । কে যেন এলো ।

দরজা খুলতে হাত বাড়াতেই যেতেই ভেঙে গেলো স্বপ্ন । বুঝলাম এই বিহরণ রিয়ল নয় আন রিয়েল । মায়া ।

আমাদের জীবনও তো মায়া কাব্য । স্টেজের এক একটি দৃশ্য । তাই তো নিজের গত জন্মকে চাক্ষুষ করলাম সম্প্রতি, সিনেমার স্লাইড শোয়ের মতন ।

যা আমার কাছে রিয়ল তা আদতে আনরিয়ল আবার যা সিংহ ভাগ মানুষের কাছে রিয়ল তা স্পিরিচুয়ালিটির কাছে আন রিয়ল অর্থাৎ মায়া ! মেট্রিক্স সিনেমাটার মতন শোনাচ্ছে কি ?

বরফ গুটিয়ে এবার বড় বড় পা ফেলে আমি সবুজ মেলবোর্নের ছায়া নিবিড় পথে । একদম কঠিন বাস্তবে । মেট্রিক্স দেখার জন্য একটি প্রেক্ষাগৃহের সামনে কফি হাতে !!

পক্ষীরাজে চড়ে

ছেলেবেলায় খুব ঘোড়ায় চড়ার স্বপ্ন দেখতাম। আমার এক বন্ধু দার্জিলিং এ পড়তো সেন্ট পলস্ স্কুলে, রুদ্র নামে। খুব বড়লোক। ও যখন গরমের ছুটিতে বাড়ি আসতো ওকে বিরক্ত করে মারতাম : ঘোড়ায় চড়িস ? খাদে নামিস ?

টাইগার হিলে ঘোড়ায় চড়ে গেছিস ?

আমার এক কাজিন বলে : তোমার গল্পের নায়ক যেন ঘোড়ায় চড়ে।

চড়িয়েছি;রাইকমলে নায়িকা জকি আর শ্যাওলা বাজে দ্রিমি দ্রিমিতে নায়ক ঘোড়সওয়ার।

নিজে ঘোড়ায় চড়ার সুযোগ আগে পেলেও এখানে এসে প্রথম এনজয় করলাম।

আমার স্বামীর এক বন্ধুর ফার্মে ঘোড়া ছিলো ব্যাঙ্গালোরের অনতিদূরে। ওখানে গেলেও ঘোড়ায় চড়া হয়নি। এবার মেলবোর্নে আমাদের ক্লাব থেকে ঘোড়ায় চড়ার আয়োজন করলো। দক্ষ জকি থাকবেন সঙ্গে কাজেই যাঁরা আগে চড়েন নি তাঁরাও চড়তে পারেন নির্ভয়ে। আমরা গেলাম। ঘোড়ার পিঠে উঠে বেশ মজা লাগলো।

প্রথমে একটু ভয় লাগছিলো। ও টগবগ করে ছুটে চললো না কিন্তু, আস্তে আস্তে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে গেলো। দু চারটে ক্যাঙ্গারু এলো লাফিয়ে। সবুজ সবুজ উপহার পেরিয়ে আমাদের ছোট নদী। ঘোড়া লাফ দিয়েই পেরিয়ে গেলো। জকি খুব শক্ত হাতে ওকে পরিচালনা করছেন। ওপরে আমি। পেছনে আরো ঘোড়া। সবার সাথেই দক্ষ জকি। আমার ঘোড়া ছিলো কালো। ওর নাম হুডিনি।

সোনার কেল্লায় লালমোহন বাবুর উটের পিঠে চড়ার মতন নাহলেও এই অভিজ্ঞতা যথেষ্ট মজার। ঘন বনের মধ্যে বুনো গন্ধে মনে মাদকতা আনে ।

গোলাপি ও সাদা থোকা থোকা ফুলে পথ ঢাকা । ছোট ছোট বাচ্চারা পিকনিক করছে । এলো এক পুরাতন প্রাসাদ । আসলে ছিলো কোনো ধনবানের বাড়ি । এখন পরিত্যক্ত । ফোয়ারা, পরী সবই আছে আগের মতন। ক্ষয়াটে বৃক্ষ।

আমাদের হর্স রাইডিং দেখে এগিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ। ঐ বাড়িটাই থাকেন।

বললেন : ভালো করে ধরে বসো মেয়ে ! নাহলে পড়ে যাবে। আমার স্ত্রীর কোমড় ভেঙে গেছে এই ঘোড়ায় চড়েই। এখান শয্যাশায়ী। সারাটা জীবন এরকমভাবেই থাকবে।

ভয় লাগলো শুনে। কিন্তু এখন নামার উপায় নেই।

নিজেকে রাজা টাজার মতন মনে হচ্ছে। রাণাপ্রতাপের ঘোড়া ছিলো কিনা চেতক ? ওর সমাধি দেখেছিলাম রাজস্থানে, উদয়পুরে। কেনা হয়েছিলো এক আরব ঘোড়সওয়ারের কাছ থেকে। ওর সাথী ছিলো নাতক। রাণা ; নাতককেই আগে পরীক্ষা করেন ও সন্তুষ্ট হন ওর পারদর্শীতায় কিন্তু কিছুদিন পরে ও আহত হয়। তখন থেকেই চেতক রাণার প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। ঘোড়ারা খুব বুদ্ধিমান ও অনুগত।

মালিক অন্তপ্রাণ। এই ঘোড়াটি, আমি যার সওয়ারি সেও খুবই বাধ্য বাহন ।

নাহলে আমার মতন উটকো লোককে পিঠে তোলে ?

এখানে আমার বাড়ির কাছেই অনেক ফার্ম হাউজ আছে। শহরের মধ্যেই। ওখানে দেখা যায় পোষা ঘোড়ার দল। কালো ঘোড়া, সাদা, বাদামী। সবই পোশাক পরিহিত। উল্টোদিকে কবরখানা। পাথরের সমাধি। ফুলে ফুলে

ঢাকা বনপথ আর দূরে বেগুনি পাহাড়, আবছা দেখা যায় । কবরের পাশের আস্তাবল সবুজ ঘাসে ঢাকা । বেশ মনোরম ।

চলতে চলতে এসে গেলো মিউজিয়াম । এখানে দেখা যাবে নানান ধরণের ফার্নিচার । বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন অভিজাত ও সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত দ্রব্য সাজানো থরে থরে । আমাকে নামিয়ে দিলো হুডিনি । তারপরে হঠাৎ ফোয়ারার দিকে এগিয়ে গিয়ে জল খেতে আরম্ভ করলো । জকি বললেন : ও এরকম করেনা হয়ত খুব তেষ্টা পেয়েছে ।

মিউজিয়াম দেখে বেরোনোর সময় জকি বললেন : ও তোমাকে খুঁজছিলো ।

আমার মানুষের চেয়ে পশুপাখীর সাথেই বেশি মাখামাখি । কারণ ওরা ঈর্ষাকাতর ও হিপোক্রিট নয় । কাউকে চিমটি কাটে না । কাজেই আশ্চর্য কি ??ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে নিজেকে একটি আম আদমী মনে হচ্ছিলো । রাজকীয় নই আমি আর ! ফিরে এলাম ইট কাঠ পাথরের নগরে, পক্ষীরাজের দেশ থেকে –

হায় রে ঘোড়সওয়ার !

পাহাড়ে পাহাড়ে

একটু অবসর নেওয়া ব্যবসার কাজ থেকে, ঘুরে আসা পাহাড়ে । মেলবোর্নের অনতিদূরে ।

লিলিডেল নামক একটি জায়গায় । একদিন বেরিয়ে পড়লাম । একটি মোটেল বুক করলাম । পাহাড়ে ঘেরা এই মোটেল । মাঝখানটা বাগান । চারপাশে গাঢ় পাহাড় । দূরে সুউচ্চ পর্বত । লিলিডেল সবুজ । চিকেন ফার্ম । ফুলের বাগিচা । পুরনো পুরনো গন্ধ ।

প্রাচীন চার্চ । মধ্যযুগীয় পাব ।

তিনদিন থাকবো । মালিক ভারি খুশি । সাধারণত মানুষ একদিন থেকেই চলে যান ।

পাহাড় আমার ভালোলাগে : বলেন রসিক মালিক । আমার বৌয়েরও । বলেন আমার স্বামী ।

আমার বাড়ি সমুদ্রের পাড়ে । সিগাল পাখির ঝাঁক, কালো রাজহাঁস ও জাহাজ দেখে দেখে আমি বোর হয়ে গেছি । তাই পাহাড় ।

প্রথম দিন শুধু ঘুম । আজকাল আমায় ভূতে ধরে । স্পিরিট মাথায় সুড়সুড়ি দেয় । তাই ঘুমাতে গেলেও বিপত্তি । একটু উঠে ঝামেলা করলাম ঐ ভূতের সাথে । তারপর ঘুম । সেদিন ছিলো পুর্ণিমা । বাইরে মিহিন আলো । দূরের পাহাড় মায়াময় ।

সকালে উঠে পাশের ম্যাকডোনাল্ডে খেয়ে নিলাম । বিশেষ ওমলেট । হ্যালপিনো দিয়ে তৈরি । এ হল এক ধরণের লঙ্কা বলা চলে । মেক্সিকান লঙ্কা । ওমলেটটি সাইজে বেশ ছোট । আলুভাজা ও গাঢ় কফি । দেখছিলাম ব্যস্ত মানুষ পদব্রজে চলেছে কাজে । খেয়ে উঠে । যাবেন সবাই মেলবোর্নে । আজকাল ওদিকে ভালো জ্যাম হয় । বেশ কিছুটা পথ । তাই এত তাড়া । সবার তাড়া । আমরা বেড়াতে এসেছি তাই তাড়া নেই । খাওয়া সেরে গেলাম

একটি প্রাকৃতিক লেক দেখতে । ঘন গাছের ছায়ায় ছায়ায় এই লেক । বেশির ভাগ অংশই ঢাকা । কিছু বাচ্চা খেলছে । মায়েরা ওদের দোলনা নিয়ে পি এন পি সি করছেন । মানুষ সব জায়গায় সমান ।

একজন লামাকে দেখলাম । জানালেন এখানে একটি মন্দির আছে । তবে বেশ দূরে । দক্ষিণী মন্দির । ঠিকানা নিয়ে গেলাম । চিরাচরিত ঠাকুর সব । নামগুলি ভিন্ন । হনুমান আনজনেয়া, কার্তিক মুরুগান এইরকম । ওঁরা তো খুব পরিষ্কার । তাই মন্দির ঝকঝক তকতক করছে । সিংহলের সব পুরোহিত এখানে । পুজো করেন । সপরিবারে থাকেন । জ্যোতিষ করেন । নবগ্রহের মন্দির আছে । মানুষ ভক্তিভরে পুজো করছেন ।

বিগ্রহগুলি কুচকুচে কালো । তাতে সুন্দর সুন্দর দক্ষিণী সিল্কের শাড়ি পরানো । কানে ও গলায় মানানসই গহনা । ঠিক যেন মানুষ । বিয়ের সাজে সেজেছেন । মনোমুগ্ধকর।

মুকুট ও পাগড়ি দেখা যায় । বিরাট মন্দির । খুব ভালোলাগলো ।

এরপরে গেলাম একটি নেপালি রেস্তোরাঁতে । আমি সব জায়গায় নেপালি খাবার খুঁজি । এখানে আছে অনেক নেপালি দোকান । খাবারের ।

খেলাম । মেলবোর্নেও আছে । ওখানেও যাই। খাই ।

দিনটা কেটে গেলো । বিকেলে গেলাম স্থানীয় বাজারে । বেশির ভাগ দোকান বন্ধ হয়ে গেছে । এখানে খুব তাড়াতাড়ি দোকান বাজার বন্ধ হয়ে যায় । বিকেল পাঁচটা ম্যাক্সিমাম ।

কিছু কিছু দোকান খোলা থাকে । আমরাও খুঁজে নিলাম । কিছু কিনলাম । স্মৃতি হিসেবে থাকবে ।

পরেরদিন ভোরে সোজা ইয়ারা ভ্যালি ওয়াইন ফার্ম । উঁচু উঁচু পাহাড়ে চাষ হয় আঙুর । সেখানে তৈরি হয় ওয়াইন । নানান ট্যুর আছে । দেখা যায় । লাঞ্চ দেয় । উপাদেয় । আমরা নিইনি । আমরা বাইরে খেয়েছি । পুরাতন একটি কাঠের হোটেলে বসে নড়বড়ে টেবিলে, নড়বড়ে গেলাসে থকথকে

বিফ স্যুপ ও মোটা লেবানিজ রুটি (সুন্দর গন্ধ থাকে এতে যা আমার ভালোলাগে) ও কচি পাঠাঁর মাংসের স্যালাড ওরা বলেন গোট স্যালাড।

এছাড়া প্রাগৈতিহাসিক একটি ট্রেনে চড়ে অনেকদূর গিয়েছি। সবুজ সবুজ উপহার দুইদিকে।

একটি জায়গায় গিয়ে থামলো গাড়ি। একটু দূরে ন্যাশনাল পার্কের গেট। জায়গাটি অসম্ভব নির্জন। কেউ নেই। আমার বর বললো : বিয়ের পরে এরকম জায়গা পাইনি এখন বুড়ো বয়সে এগুলো কোথার থেকে ভুঁই ফুঁড়ে বার হচ্ছে কে জানে !

নাহ্ নাহ্ ওর এতখানি নির্ভুল বাংলা বলার ক্ষমতা নেই। ও বেংলিশে বলে ।

আকাশ দেখা যাচ্ছে না। একটু দূরে গিয়ে অবশ্য দেখলাম আজব দৃশ্য যা বন্য কল্পনাতেও আসেনি। এক মেম নগ্ন হয়ে বসে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিচ্ছেন।

কয়েকটি জিপ হঠাৎ পাশ কাটিয়ে গেলো। বড় বেমানান এই পরিবেশে। মন উদাস। পরিযায়ী। উড়ে যায় হংসবলাকার মতন। নীল দিগন্তে।

আরো দূরে ড্রাইভ করে গেলে একটি সুউচ্চ জায়গা। সেখানে শুধু একটি রিসর্ট। আলপাইন কিছু একটি নাম। তার আগে ও আশেপাশে কয়েক মাইল জুড়ে শুধু রূপা মতন গাছ। কোনো পাতা নেই। কোরক নেই। খালি ডাল। রূপা মতন তারে ভরা ডাল। নানা আকৃতির। আকাশের দিকে মুখ করে হাহাকার করছে। কিছু কিছু গাছে দাবানলের চিহ্ন।

এখানে খুব দাবানল লাগে। প্রায়ই। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ঘরবাড়ি। তারই নমুনা দেখলাম লেখা আছে গাছের গায়ে।

রাস্তা সরু। কাঁচা। অনেকটা হিমালয়ের রিমোট জায়গার মতন।

নেপালে যেতে খুব ইচ্ছে করে আর ভূটানে। কবে যাবো জানিনা। এগুলি দেখে মনের আশ মেটাই। এই বছর শেষদিকে ভারতে যাবার বাসনা আছে

। রাজস্থানের দিকে যাবো । আমরা একটি ফাইভ স্টার রিসর্টের মেম্বার । তাই অনেক ছুটি জমা হয়ে গেছে । সেগুলি খরচ করতে হবে । তাই রাজস্থানে যাবো । ওখানে ওদের কিছু রিসর্ট আছে । তিন নম্বর নভেলটি ওখানকার ট্রাইবসদের নিয়ে লেখার ইচ্ছে আছে । একটু স্টাডি করবো ওদের ।

।এখানে যাঁর ছবি ছাপা হয় সেই পেন্টার রজত আমাকে কিছু টিপস্ দিয়েছে ওখানে যাবার ব্যাপারে । ও তো আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে । কিন্তু খুবই হাম্বেল । বড়াই শুধুই মিনি মিডিদের । আমাকে বলেছে : পুষ্কর মেলার সময় যেও । ওটা দারুণ ।

আমার পুষ্কর মেলা নিয়ে একটি কবিতা আছে ।

ওয়াইন ফার্ম দেখিনি বলে আক্ষেপ নেই । অ্যাডেলেডে দেখেছিলাম । ওয়াইন টেস্ট করেছিলাম । আমি মদিরা প্রেমি নই । তাই বিশেষ উৎসাহ নেই ওদিকে ।

রাস্তাটি অপরূপ । পাহাড় অনেক আছে তবে এই পাহাড়টি বেশ । ডানদিকে নদী সাথী, কখনো হলুদ বনভূমি, লালচে গ্রাম, খয়েরি উপত্যকা, বেগুনি মানুষ -----

কয়েকটি বাঁক থেকে নিচের দৃশ্য দেখা যায় । ওঁরা বলেন নানান পয়েন্ট ।

ভিউ পয়েন্ট । খরোস্রোতা নদী, রূপালী হাঁস, সোনালী চর, কমলা ফুলের বন ।

মন ভালো হয়ে যায় । জীবনানন্দ কি এইসব গ্রাম মানস চক্ষে দেখে ছিলেন ?? কবিতাগুলি তারই সাক্ষী ।

ইয়ারা ভ্যালি থেকে আরো অনেক জায়গায় যাওয়া যায় ।

এটা একটি মূল কেন্দ্র । মেলবোর্নের এত কাছে এত্তো সুন্দর একটি জায়গা, সত্যি দেখার মতন । আরো একটু দূরে গেলে ম্যাল্সফিল্ডের দিক -

সেখানে বরফ পড়ে শীতকালে । স্কি রিসর্ট আছে বললেন মোটেলের মালিক । পাহাড়ের নামগুলিও বললেন ।

নেড কেলি নামক একজন রবিন হুড ইমেজের মানুষ ছিলেন এখানে । ম্যান্সফিল্ড ওঁরই জায়গা । ওঁর আত্মীয়দের নাকি আজও চাকরি পেতে অসুবিধে হয় ।

লিলিডেলে যাবার আগেও ভাবিনি এত ভালোলাগবে । গিয়েছিলাম শহর থেকে একটু মুক্তি নিতে । ফিরে এলাম চাঙা হয়ে । শীতল হয়ে ।

সত্ত্বা আমার হংস মিথুনের সাথে পাল্লা দিয়ে আকাশে বাতাসে ধাবমান ।

লিলিডেল । লিলিডেল ।

ক্লান্তি ফেল । মন বিন্দাস ।

ফার্স্ট ক্লাস ।

হ্যাঁ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন দেখলাম কদিন ওখানে বসে টিভিতে । যেখানে খেলা হচ্ছিলো সেই স্টেডিয়াম তো আমার বাড়ি থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ।

এত বড় একটি ইভেন্ট হচ্ছে আমার বাড়ির এত কাছে, আসছেন আমার কলেজ জীবনের হার্ট থ্রব প্যাট ক্যাশ, উহ্ দারুণ ব্যাপার ।

প্যাট ক্যাশ চেয়েছিলেন ওর দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথেই বাকি জীবনটা কাটাতে । উনি চাননি । তাই ডাইভোর্স হয়ে যায় । প্যাট অনেকদিন একা ছিলেন । অবাক লাগে । হ্যান্ডসাম, সাক্সেসফুল মানুষেরাও চান একজন সাথীর সান্নিধ্য । সবাই প্লে বয় নন । প্রেয়সীর জন্য জীবন পণ করতে পারেন । তবুও তাঁদের হেলায় ফেলে চলে যান কোনো কোনো ভগ্যবতী রূপসী । অবশ্য প্যাটের দ্বিতীয়া স্ত্রী রূপসী ছিলেন কিনা আমি জানিনা । সো স্যাড !!

এবার নিজ নিকেতনে । বাড়ি ফিরতে ভবঘুরের কোনকালেই ভালোলাগে না ।

আমারও লাগেনা । তাই অপেক্ষায় রয়েছি পরের ঘোরার প্ল্যানের । এখন বিজনেস হয়েছে । ঘোরার চ্যাপ্টার চলবে বিলম্বিত লয়ে ।

তবে শুভস্য শীঘ্রম, গুণীজন বলে গেছেন --মার্চে যাচ্ছি পার্থে !!

অপার্থিব পার্থে খনন

শীতল ভোরে উষ্ণ শহর পার্থে । আমাদের শহর মেলবোর্ন থেকে পার্থ পিছিয়ে কারণ ও পশ্চিমে । ঘন্ট চারেকের তফাৎ মনে হয় ।আমরা খুব ভোরে রওনা দিলাম । পৌছালাম ওদের সকাল সাতটায় । বিমান বন্দরে প্রাতরাশ সেরে নিলাম । ফাদার ব্যারি মে-র ব্র্যান্ড নিউ অডি গাড়ি করে আমাদের নিয়ে গেলেন হোটেলে । উনি খুব বয়স্ক । ৭৪/৭৫ । তবু সুগঠিত অভিজাত । ব্যক্তিত্বপূর্ণ ।

আগে সুপার কপ ছিলেন । পুলিশ প্রিস্ট । অর্ডার অফ অস্ট্রেলিয়া মেডেল পেয়েছেন সাহসিকতার জন্য । এখানকার খুব প্রেস্টিজিয়াস পুরস্কার । আমাদের পদ্মশ্রী - পরমবীর চক্র ঐসব ধরণের । ভদ্রলোক খুব ম্যাজিস্টিক । আমরা গিয়েছিলাম ব্যবসার কাজে । কিছু টেলিভিশানের মানুষের সাথে দেখা করতে কারণ আমার বিজনেসটি অ্যানিমেশানের । ফাদারের সাথে আমাদের ভালো সখ্যতা হয়েছে । উনি অনেক বই লিখেছেন ।

পার্থ শহরটা খুব সবুজ । রাস্তা ঘাট চাওড়া । মেলবোর্নের থেকে ছোট । লোকজনের মধ্যে আদিবাসী, ওরা বলেন অ্যাব অরিজিন তাঁরাই বেশি । এখানে মেলবোর্নে ওদের কম কম দেখা যায় । আমি তো বছর তিনেক হল এখানে আছি তার মধ্যে আড়াই বছর হল মেলবোর্নে । ওদের বেশি দেখিনি । পার্থে প্রতিটি বাঁকে ওরা । এটা তো ওদেরই বাসভূমি ।

আমাদের হোটেল ছিলো শহরের কেন্দ্রস্থলে । ফাদার বললেন : ওটা রিচ ম্যানদের লেন ।

যেখানে তোমাদের হোটেল ।

আমাদের হোটেলটি বেশ বড় হলেও খুব পুরনো । অনেকটি প্রাচীন প্রাসাদের মতন ।

সামনেই একটি ওভার ব্রিজ যা পেরিয়ে চলে যাওয়া যায় রাস্তার অন্য পাশে। সেদিক দিকে ধরে ফেলা যায় ফ্রি বাস। সারা শহরে চরকি পাক দিচ্ছে। মিউজিয়াম, আর্ট সেন্টার সব দেখা যায়। আমরা একটি হরে রাম হরে কৃষ্ণ রেস্তোরাঁতে খেলাম। বাঙালী খাবার। সাহেব মেমরাই রান্না করে দিচ্ছেন। পায়েসও ছিলো। আর ফুলকফির ডালনা, আলু ভাজা, পালং শাকের ঘন্ট, ঝুর ঝুরে ভাত, কুমড়োর ঝোল এইসব। আর বেশ কিছু পাকোড়াও ছিলো।

এখানে ওদের খুব বড় মন্দির আছে। অনেক দূরে কোথাও। সুবিশাল কমপাউন্ড। মেলবোর্নে এরকম নেই। ছোট একটি আছে আমার বাড়ি থেকে মিনিট ১২/১৩ দূরে।

এদিকে প্রচুর খনি তাই অনেক খনিজ মানুষ দেখলাম। ইঞ্জিনীয়ার বা শ্রমিক।

আই আই টির একটি মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারের গ্রুপ দেশে যাচ্ছেন। তারাও ঐ হরে কৃষ্ণ মন্দিরে খাচ্ছিলেন। তবে বাঙালী নন। মাইনের অন্দরটি কেমন ভয়াবহ জানা গেলো ওদের সাথে কথা বলে। খুব ভয়ের। আর সেফটির কারণে অনেক মানুষ এইসব মাইনে কাজ নেন না। তাই প্রচুর পয়সা দেয় ওদের। রাজার হালে রাখে কোম্পানিগুলি।

এরপরে দেখলাম মিউজিয়াম। বেশিরভাগই জন্তু জানোয়ারের ফসিল। কিছু স্থাপত্য আছে। একটি বিয়ের গাউনের প্রদর্শনী চলছিলো। টিকিট কেটে বলে আমি যাইনি। পয়সা বাঁচানোর জন্য নয় আমার প্রয়োজন নেই বলে। শহরে ভ্রাম্যমান বাসগুলির নাম ব্লু ক্যাট, ইয়েলো ক্যাট বা রেড ক্যাট। এক একটি নিয়ে যায় এক একটি পথে। আর এখানে সমস্ত টানেল ফ্রি। আমাদের শহরে টানেল ক্রস করলে টোল দিতে হয়।

পার্থে কীভাবে সাহেবেরা এসে লোকাল আদিবাসীদের বসতিকে আধুনিক করলো সেইসব লেখা আছে অক্ষরে ও ছবিতে, ঐ যাদুঘরে। অস্ট্রেলিয়াতে একটি ট্রেন জার্নি আছে কয়েক হাজার কিলোমিটার। সেই সম্পর্কে

জানলাম। খুব রোমহর্ষক সেই যাত্রা। আর একটি ট্রেন লাইন আছে সেটি সোজা, স্ট্রেট। সেটিও কয়েক হাজার মাইল।

বড় বড় বুশ বা ঝোপ ঝাড় কেটে বসতি হয়। এদের কালচার অন্য। বুশ কালচার। কুইজিন আলাদা। ক্যাঙারুর মাংস খায়। নানান গাছ শাক পাতা গুগলি শামুক খায়। সভ্য সমাজে যেগুলি ততটা জনপ্রিয় নয়। জনপ্রিয় লেখক ডি এইচ লরেন্স এখানে এসেছিলেন।

উনি ওঁর বন্ধুকে চিঠি লেখেন যে এই বুশের কাছে থেকে মনে হচ্ছে যে এখানে স্পিরিটরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

From Internet :: (1885-1930), the English novelist, came to Australia from Ceylon in 1922, arriving with his wife Frieda at Fremantle on 4 May. In Perth, where he stayed for two weeks, he met some of the local literati and the Quaker nurse Mollie Skinner, with whom he collaborated in a novel, *The Boy in the Bush* (q.v., 1924). Katharine Susannah Prichard, who missed meeting him, later corresponded with him and attempted to interest him in Australian literature. After leaving Perth, the Lawrences arrived in Sydney on 27 May. They spent a brief time in the city and then rented a house, Wyewurk, at Thirroul, a mining village on the NSW coast, where they remained until their departure for San Francisco on 11 August. In eastern Australia Lawrence appears to have led a deliberately isolated life, mainly devoted to the writing of his novel, *Kangaroo* (q.v., 1923). The extent of his involvement in and knowledge of Australian political life is uncertain; although Lawrence's letters, Frieda Lawrence's autobiography *Not I, But the Wind* (1935), and his numerous biographers suggest that his involvement was minimal, recent researches have tentatively suggested that he may have had personal knowledge of a secret political organisation. Of these, the most

substantial is Robert Darroch's *D.H. Lawrence in Australia* (1981).

In his letters Lawrence describes Australia as 'a weird country - fascinating - but humanly non-existent' and in both *The Boy in the Bush* and *Kangaroo* he vividly expresses his response to the 'subtle, remote, *formless* beauty' of the bush, its indifference to humanity, its 'fern-world' aura and separation from history. Almost equally evocative are his descriptions of Australian suburbia and the ramshackle impermanence of small coastal settlements.

Read more: http://www.answers.com/topic/d-h-lawrence#ixzz2PlYD2cu0

মিউজিয়ামটি বিশাল। চার পাঁচ তলা। ঘোরানো সিঁড়ি। সুবিশাল চাতাল। পুরোটা দেখা হয়নি। এছাড়া দেখলাম সমুদ্র। শান্ত, সমাহিত। ঘন নীল।

কিছু লিফ লেট এনেছি। সেখান থেকে তুলে ধরছি কি কি আরো দেখার আছে।

বন্য ডলফিনের সাথে সাঁতার কাটা যায়। যেতে হবে পার্থের দক্ষিণে, মাত্র ৪০ মিনিট। রকিংহামে। টেরি হাউসন সার্ফ করে বড় হয়েছেন। ১৯৮৯ সনে উনি বন্য ডলফিনের সাথে সাঁতারের স্বপ্ন সফল করেন। রোজ ওদের ফলো করতেন। ছোট নৌকো তে। ওরা কি করে, কোথায় যায় কখন খেলার মুডে থাকে। তারপরেই গড়ে ওঠে লোগোর সাথে সখ্যতা। মহিলা ডলফিন। বন্ধুত্বপূর্ণ। পরে আরো ডলফিনেরা জড়ো হয়। এখন অন্য মানুষেরাও সাঁতার কাটেন। অনেক পুরস্কার পেয়েছ এই ট্যুর।

রটনেস্ট দ্বীপে গেলে দেখা যাবে :

৬৩ টি সৈকত ও ২০ টি উপকূল। স্বচ্ছ জলে জাহাজ ডুবীর চিহ্ন। অ্যাব অরিজিনাল কালচারের সম্পর্কে হাতেকলমে সব অভিজ্ঞতা লাভ করা

যাবে । তিমি মাছ দেখা যায়, সি লায়ন ও অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের দেখা মেলে । নানান লাইট হাউজ আছে । নৌ বিহারের ইতিহাস নিয়ে মিউজিয়াম ও বাতিঘরের নানান কথা জানা যায় ।

লোমাস কটেজ হল এক কয়েদীর বাড়ি । জন বেনেডিক্ট । এখন ফটোর প্রদর্শনী হয় এখানে ।

২০০০ জন সাঁতারু ১৯ কিমি সাঁতার কাটেন এখানে বছরের নানান সময় । পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া সামুদ্রিক খানার জন্যে নামী । এখানে মেলে সুস্বাদু খানা ।

Didgeridoos এক বিশেষ অ্যাব অরিজিনাল বাঁশি । বিশাল সাইজ । সুমধুর সুর বার হয় । মেলবোর্নের ফুটপাথে বসে বাজায় কিছু চীনা মানুষ । এখানে দেখলাম আদিবাসীরা বাজাচ্ছেন । সব ট্র্যাডিশনাল ইউক্যালিপ্টাস গাছের কান্ঠ থেকে তৈরি ।

অনেক কিছুই দেখার আছে যা অনবদ্য ।মৎস্য শিকারির গ্রাম যেখানে আছে সাদা বালির স্তুপ, বড় বড় গম ক্ষেত পেরিয়ে সারমেয়র সমাধি । সিমেটারি । স্থানটির নাম কোররিগিন । হাইডেনে আছে ঢেউ এর আকৃতির একটি গ্রানাইটের পাথর । সুবিশাল । যেরকম বড় বড় ঢেউ উল্টে আসে সেরকম । ২ মিলিয়ন বছরের পুরনো এই পাথর ।

মুন্দারিং ও সয়র্স ভ্যালি বিখ্যাত কান্ঠ শিল্পের জন্য । মান্দুরাহতে আছে খালবিলের অপরূপ নগর । দক্ষিণ গোলার্ধের সবচেয়ে লম্বা কাঠের জেটি এখানেই । মার্গারেট নদীর আশেপাশের গুহায় অসাধারণ রক ফর্মেশান আছে শতাব্দী ধরে । নিশির পদচিহ্ন বুকে করে । এখান নিশি ডাকে শারদ প্রাতে । এত গাঢ় আঁধার । রাজহংসী ভ্যালিতে মানে সোয়ান ভ্যালিতে প্রাচীন ওয়াইনের স্বাদ নাও । খুব নামকরা এখানকার । হিলারি বিচে স্ফটিক জলে সিনান করে সজল এলো চুলে বসিয়াছিলো প্রিয়া পার্থের উপল উপকূলে ।

পার্থের পুরনো বন্দরও দেখবার । কার্‌রি ও মার্‌রি নামক ১০০ বছরের পুরনো বৃক্ষ দর্শনে যেতে হবে নানান বনে । আছে প্রচুর ন্যাশনাল পার্ক ।

থাকবেই । আদিবাসীদের আদিম স্থান । খনি শহর । আদিমতার গন্ধ এখানেই বাতাসে ।

কালবারি বনে গর্জেস দেখুন, অপরূপা । গভীর খাদের বাহার । মাঙ্কি মিয়ায় আছে দুষ্টুমিতে মন মাতানো ডলফিনের ঝাঁক ।

Nambung National Park is home to the Pinnacles Desert, a series of eerie limestone formations sporadically scattered over vast yellow, rippled sand dunes. Just 245km or three hours drive from the center of Perth city, the Pinnacles make for a comfortable day trip where visitors can walk amongst these spooky stones and visit the nearby fishing village of Cervantes. Practically unknown to the wider public until the late 1960s, the Pinnacles Desert is part of the Nambung National Park. The Pinnacles Desert was added to the existing National Park that was named after the winding Nambung River. Nambung means crooked in the local Aboriginal tribal language. It is a park with a 26km stretch of sparkling coastline bordered by rolling ancient sand dunes that extend inland into banksias woodlands. Pretty red river gum trees line the banks of the Nambung River until it disappears into limestone caves. Massive sand dune fields characterise the area near the coast where the Pinnacles Desert lies. The area surrounding the Pinnacles Desert comes alive with wildflowers from August to October.

The limestone formations of the Pinnacles vary in size and shape; some are as small as a mouse whilst many are as big as 3.5m high. These unusually shaped rocks have been likened to tombstones, termite mounds and even fingers. The Pinnacles Desert is best seen at dawn or dusk when they cast

long, strange shadows over the rippling yellow sand dunes. Although the desert teems with wildlife, most animals are nocturnal. However, it is not uncommon to see western grey kangaroos, emus and many sorts of reptiles and birds like black-shouldered kites hanging around the strange stones.

(Text taken from Internet)

পার্থে কয়েকজন মানুষের সাথে আলাপ হল যাঁরা টিভিতে কাজ করেন অনেকদিন ধরে।

আমার কর্মসুত্রে আলাপ। ওঁদের ব্রডকাস্টিং এর বিজনেস। খুব মজার মানুষ।

আমার এক ভাগ্নে এখানে এসেছে ভারত থেকে, ইস্টারে ভবঘুরে গার্গী ফাটিয়ে দিয়েছে ঘুরে। একদিনও বাড়ি ছিলো না। সকালে উঠে বেরিয়ে যেতাম ফিরতাম রাতে।

এই ভাগ্নে বিজনেস ক্লাসে যাতায়াত করে ইন্টারন্যাশেনাল এয়ারলাইনে। বাচ্চা ছেলে। ত্রিশও হয়নি। আর দাঁত নখ পড়ে যাওয়া বুড়ি আমি পার্থে গেছি সস্তার প্লেনে। তবে বেশ ভালো। টাইগার এয়ার ওয়েজ। ভারতের সস্তাগুলোর মতন নয় যে সিট খুলে হাতে চলে আসে ! আর যাতে সব ফেরিওয়ালা ওঠে।

--শোন- পাপড়ি চাই ! আলু কাবলি নেবে গো ! হাঁকতে হাঁকতে যায়।

ওঁদের বললাম। ওঁরা শুনে খুব হেসে বললেন : তোমার বিজনেস দাঁড়িয়ে গেলে আমাদের সবাইকে বিজনেস ক্লাসে ইন্ডিয়া নিয়ে যেও ---

তো আমার এই ভাগ্নে আবার গায়ক মান্না দের বাড়ি যায়। উনি এখন ব্যাঙ্গালোরে থাকেন। খুব ভোজন রসিক। এক দক্ষিণীর বিয়েতে গিয়ে বলেন : টক তেঁতুলের ভাত খাওয়ানোর জন্য ডেকেছো ? আমি এতদূর গাড়ি চালিয়ে আসতে পারবো না এইসব খাবার জন্য -

কিলো খানেক সিঙারার পুর কিনে ফ্রিজে রাখা থাকে, একটি মিষ্টির দোকান থেকে দিয়ে যায় । চাকর ভেজে দেয় । একটু একটু করে খান । মজার মানুষ উনিও । বয়স প্রায় ৯৩ । আমি এবার দেশে গেলে ওঁর সাথে দেখা করবো । আমাকে দেখে উনি মূর্চ্ছা যাবেন । এই মেয়েটি -র বয়স আমার অর্ধেক, অথচ কিছুই খেতে পারেনা, প্রায় মর মর অবস্থা এমনই স্বাস্থ্যের ছিরি ! ওঠ, হাঁটো, দৌড়াও !

চুপি চুপি বলি : আসলে আমার প্রিয় গান : ছম ছম বাজে রে পায়েলিয়া ওর প্রকৃত গায়ককে গেয়ে শোনাবার ইচ্ছে আছে । দেখি ইচ্ছেপুরণ হয় কিনা !

গার্গী চলে-- ছালে কে গাগ-রিয়া !!

ছম ছম বাজে রে পায়েলিয়া ---

আমার এক ভাসুর যে ওঁনার বায়োগ্রাফার !!

উনি সম্প্রতি জানতে চেয়েছিলেন : ফেসবুক আর টুইটারটা কি আমাকে বোঝাও ।।

বৃষ্টি বনের কাব্য

মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে দৈনন্দিন সাদাকালো জীবনটাকে একটু রঙে চুবিয়ে নিতে । মনে হয় হারিয়ে যাই সবুজের খোঁজে । যে শহরে আমার বাস সেখানে যদিও সবুজের কোন কমতি নেই তবুও মনে হয় চলে যাই দূরে কোথাও-বনজোছনায়, সবুজ অন্ধকারে ..... !

দক্ষিণ ভারতের চারটি রাজ্যের মধ্যে কেরালা সবচেয়ে রূপসী । অন্য তিন রাজ্য কেরালার কাছে রূপের হাটে হার মেনেছে । চারিদিকে শ্যামল আভা ও সজীবতা । অনেকটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বা আসামের মতন ।সেই রূপমাধুরী চোখ ও মনকে তৃপ্ত করে । কেরালায় আছে একটি বিশাল রেন ফরেস্ট --আমি বলি বৃষ্টিবন । প্রকৃতি, রসকলি হয়ে আমার অঙ্গরাগ । আমি-- যাকে পাগল করে দেয় ছোট্ট মৌরিবন সে যে বৃষ্টিবনে যাবেই এ আর নতুন কথা কি ! তাই অবসর যাপনের জন্য আমার শহর থেকে ২৯৩ কিমি দূরে, পশ্চিমঘাট পর্বতের বৃষ্টিবনে যাবো ঠিক করলাম ।

উত্তর কেরালায় লাক্কিড়িতে আছে একটি সুন্দর রিসর্ট । নামটি তার 'Vythiri' ঘনজঙ্গলের ভেতরে পাহাড়ের ধাপে ধাপে তৈরি হয়েছে এই রিসর্ট ।প্রতিটি কুটীরম্ (কুটীর) সবুজ বনানীর কোলে ঝর্ণার ধার ঘেঁষে নির্মাণ করা হয়েছে প্রকৃতিকে একটুও বিরক্ত না করে । কিছু কিছু কুটীর পাহাড়ের গুহায় তৈরি করা হয়েছে --গুহাটিকে প্রায় অবিকৃত রেখে ।আদিমতার সঙ্গে আধুনিকতা এই রিসর্টকে এক অপূর্ব মাত্রা দিয়েছে ।

আজকাল ইকো-ফ্রেন্ডলি, ইকো-টুরিজম্ এইসব কথা খুব শোনা যায় । এইসমস্ত শব্দ Vythiri র সঙ্গে জুড়ে গেলেও ইকো-নমিক হয়ত নয় । বেশ এক্সপেনসিভ ।

কর্নাটক থেকে কেরালা যাবার এই পথ ভারি সুন্দর । যদিও প্রথমে রুক্ষ মালভুমি আসবে, কিন্তু ব্যাঙ্গালোর-মাইশোর হাইওয়ে দিয়ে না গিয়ে যদি কনকপুরা রোড হয়ে যাওয়া হয় তাহলে রুক্ষতার কোন আভাস পাওয়া যাবে না । বদলে সোনারঙা ধানক্ষেত, কৃষ্ণচূড়া বন, পদ্মপুকুর ও তাতে অসংখ্য পানকৌড়ি বা মাছরাঙা আর ছায়া সুনিবিড় ছোট ছোট জনপদ সঙ্গী হবে ।

মাইশোর পেরিয়ে গেলে একসময় দুপাশে জঙ্গল আসবে ।আর একবার কেরালায় ঢুকে পড়লে শুধু সবুজ আর সবুজ । বড় স্নিগ্ধ ও নয়নাভিরাম সেই রূপের ছোঁয়া । বনবীথিকায় বিশ্রাম নিচ্ছেন বনবালারা ।তাদের কক্ষ কচিকাঁচায়

ভরা হলেও বক্ষ অনাবৃত -কয়েক মূহুর্তের জন্য মনে হতেই পারে যে আদিম যুগে ফিরে গেছি ।বনচরদের আলতো করে পাশ কাটিয়ে আমরা যখন রিসর্টের মুখে পৌঁছলাম তখন সাঁঝবাতি রূপকথা বলতে শুরু করেছে।

রিসর্টে যেতে হলে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সাড়ে তিন কিমি মেঠোপথ পাড়ি দিতে হয় -চলতে চলতে মনে হয় 'পথ গেছে বেঁকে -কোথায় কে জানে !'অবশেষে আসবে রিসেপশন । সেখানে প্রবেশ করার পরে মূল রিসর্টে যেতে হলে একটি ঝুলন্ত কাঠের ব্রিজ পার হতে হয় । নিচে কলস্বনা পাহাড়ি ঝোরা ।বর্ষায় উদ্দাম -যেন আমাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করার জন্য অপেক্ষা করছে ।ব্রিজটিতে একটি পা দিলেই সেটি প্রবল ভাবে দুলতে শুরু করে --অদ্ভুত বিড়ম্বনা ----আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে স্পষ্ট শুনতে পেলাম ' বল হরি-হরি বোল !'যাইহোক কোনক্রমে কর্তার জামা খামচে ধরে পৌঁছানো গেল ওপারে ।সে এক অপূর্ব ঝিঁঝিঁ রাজ্য ! ঝিঁঝিঁ গন বিরামহীন ভাবে সিম্ফোনী বাজাচ্ছে ।যেন 'বিঠোফেন, মোৎজার্ট, কায়কোভস্কি মায় য়্যানি ও ভেনেসা মে শুনিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে --এরকম অসাধারণ উপায়ে স্বাগতম আর কোন রিসর্ট করেনি ।

হাল্কা জলযোগ করে একটি গাছের গুঁড়ির ওপরে বসলাম । অরণ্য বড় নেশা ধরিয়ে দেয় । সেই নেশার ঘোরেই কিনা জানিনা হঠাৎ দেখলাম বিন্দু বিন্দু মুক্তো পড়ে আছে পায়ের কাছে । অবাক কান্ড ! হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়ে দেখি --ওমা ! এতো আঁঠা ! গাছের গা বেয়ে বেয়ে পড়ছে । প্রকৃতির কি অপূর্ব সৃষ্টি । এমনিতেই জঙ্গলে এলে মনে হয়ে কেউ এখানে এক রাজকন্যাকে বন্দী করে রেখেছে -যার নাম : রাত্রি ।

হঠাৎ কিছু ছেলেপুলের কোলাহল শোনা গেল --এগিয়ে গিয়ে দেখি কারা যেন কিছু স্বল্পবসনা সুন্দরীকে দেখে সিটি মেরেছে -সেই নিয়ে চূড়ান্ত গোলমাল। মনে মনে ভাবলাম বনে এসে সভ্যমানুষ বুনো হয়ে গেছে ।

এমন সময় প্রহরী ছুটতে ছুটতে এলো । পরে জানা গেল, এই রিসর্টে বসবাসকারী একদল পাখি -যাদের পোষাকী নাম "Malabar Whistling Bird'- এই সিটিকান্ডের জন্য দায়ী ।তাদের ডাকটাই সিটি বাজানোর মতন । প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়া একে আর কি বা বলা যায় ?

লাক্কিড়ি, বৃষ্টিপাতের দিক থেকে বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় । চেরাপুঞ্জি -মৌসিনরাম এর পরেই এর স্থান ।যেকদিন ছিলাম আমরা সারাদিন রিসর্টের মধ্যেই ঘোরাফেরা করেছি । সকালে ছোট ছোট ট্রেকে গেছি । সবুজের মধ্যে হারিয়ে যাওয়াটাও রোমাঞ্চকর । বেলা বাড়লে ফিরে এসে নানান অথেনটিক কেরালা কুইজিন দিয়ে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনপর্ব সেরেছি । কয়েকটির নমুনা দেওয়া যাক ।

অভিয়াল (নারকেলে চোবানো থকথকে সবজি)

নারকেল তেলে ভাজা অমলেট

নারকেল ছড়ানো মূর্গি

ইলা-আডা (চালের পাতুড়ি)

প্লেন কাঁচকলা সেদ্ধ ।

মারাত্মক টক দই।

কাজেই হরষে- বিষাদে বাঙালীর রসনা তৃপ্ত হয় ।

আমাদের পাশের কুটিরে এক মার্কিনি দম্পতি উঠেছিল । একদিন সকালে দেখলাম ভদ্রমহিলা মুখ ব্যাজার করে ঘুরছেন । ব্রেকফাস্ট টেবিলে আলাপ হয়েছিল । জিগেস করলাম --কি ব্যাপার বেড়াতে এসে মুখ কালো কেন ?

তো বললেন যে ওদের বারান্দায়, একটি টেবিলে হ্যান্ডিক্যামটা রাখা ছিল, আমাদের এক পূর্বপুরুষ সেটি তুলে নিয়ে যায় ও ওনার চোখের সামনেই ঝর্ণাতে ছুড়ে ফেলে ---

'বাব্বা কি দাপট ! '

যদিও বাঁদরের কাছে আদরের চেয়ে এই ব্যবহার পাওয়াই স্বাভাবিক ।

সকালে কথায় কথায় এনার কর্তাকে বলেছিলাম যে আপনারা তো আমাদের থেকে পিছিয়ে আছেন - শুনে উনি প্রায় মূর্চ্ছা যান আরকি !

এমন ভাবে আমার পানে চাইলেন যেন আমি বনমানুষ -সভ্য জগৎ সর্ম্পকে কিছুই জানিনা । তা আমি যখন বললাম যে সময়ের হিসাবে আপনারা পিছিয়ে তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন । এহেন আধুনিক মানুষদের যে পূর্বপুরুষদের সঙ্গ পছন্দ হবেনা বলাই বাহুল্য । হয়ত ইংরেজিতে গালি দিয়েছিলেন । বাঁদর দাঁত চেপে ইংরেজি বলতে পারেনি । সাহেব গেছে চটে ।তাইনা দেখে বাঁদর গেছে চটে.....। কে বলতে পারে ? অবশ্য এসব নেহাতি আমার কল্পনা আরকি ।

যাইহোক বাঁদরের বাঁদরামো দেখতে দেখতেই হঠাৎ শুনি কুহুকুহু । পাহাড়ের গন্ধ মেখে নেমে গেলাম অনাঘ্রাতা ঝর্ণার বুকে । ঝর্ণাটি দৃষ্টিনন্দন । বর্ষায় তার ভরা যৌবন । জোলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে রঙ বেরঙ এর নুড়ি পাথর ও রাশি রাশি ঝরাপাতা ---পাশেই একটি ছোট্ট বনতল ।

নরম সবুজ ঘাসে একদল মেষশাবক চড়ছে । দেখে মনে হয় কটি উলের বল গড়াগড়ি দিচ্ছে -একজন আরামে ডুবে থেকেও আমাদের পদশব্দে চোখ তুলে চাইলো ।

যেন মিহিসুরে বলতে চাইছে :

ন'ইকো উলের বল

আমরা ভেড়ার পাল

দেখতে গোলগাল

আর খুশিতে মাতাল ।

সেদিন বিকেল থেকেই শুরু হল প্রবল বর্ষণ । বৃষ্টিবনে বৃষ্টি -আহা ! বাতাসে মেঘমল্লারের তান । আমাদের এক বন্ধু খুব বিরক্ত হল । সারাটা দিন গৃহবন্দী হয়ে থাকতে হবে ভেবে ।একটা মোটা আবহাওয়ার ব'ই নিয়ে খালি ঘরবার করছে -কপালে ভাঁজ ।

'মনে হচ্ছে আকাশ ফুটো হয়ে গেছে । আবহাওয়া বার্তা কিন্তু বলছে এত বৃষ্টি হবার কথা নয় ।'

আমি বলে উঠি - 'ওরে তুই থাম -এত অঙ্ক কষে সব হয় নাকি ? আমি তাহলে কবেই Godel -Fermat কে দিয়ে জীবনের অঙ্কটা কষিয়ে নিয়ে আসতাম । আর ভাগ্যিস্ অঙ্ক দিয়ে সব হয়না ।তাইতো জগতে এত মাধুর্য ।

নাহলে সব শুষ্কং কাষ্ঠং হয়ে যেত । আর কোনদিন বৃষ্টি হতনা - দুনিয়ার কোন কোণে লেখা হতনা বৃষ্টিবনের কাব্য ! সেকি কম দু:খের ?

কেরালার এই অঞ্চলেই এই রাজ্যের সিংহভাগ উপজাতি বাস করে । তাদের ভেতর বেশির ভাগ অরণ্যচারী । এদের নিজস্ব শিল্পকলা ও ভেষজ ওষুধের ভান্ডার নিয়ে এরা অনন্য । Vythiri র কাছে আছে দুটি স্যাঙচুয়ারি । মুতুঙ্গা ও তোলপেট্টি।নানান পশুপক্ষীর দেখা মেলে এখানে যা বিরল বলে চিহ্নিত।৭০০ থেকে ২১০০ উচ্চতায় আছে এলাচ, কফি, চা, গোলমরিচ ও ভ্যানিলা বাগান ।৩ কিমি দূরে আছে Pookote lake -এটি পদ্মপুকুর । Chembra peak (6890 ft) এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ।

দেবদারু, পাইন, চির, সিলভার ওক গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় পেস্তা রঙের পাহাড়ের চূড়া, গাঢ় কুয়াশার ওড়নায় ঢাকা ।সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে একটি লোকশিল্পের দোকনে ঢুকি । গরম কফিতে চুমুক দিয়ে

স্থানীয় মানুষের মন্থর জীবনের রেশটুকু নিতে চাই । প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গেছে ওদের দৈনন্দিন সবকিছু ।

বৃষ্টি থেমে গেছে । রোদের দেখা মিলেছে । যেন কাঁচা সোনা গলে গলে পড়ছে । মোলায়েম শীতের পরশে গায়ের চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিলাম । কলকাতার কথা মনে পড়ছে । এখনো ওখানে নাকি বেশ গরম । আর এখানে আমি চাদর গায়ে দিয়ে আছি । 'সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই জগৎ !'

ডিনার শেষে জঙ্গলের আদিমরূপটা দেখার জন্য বাইরে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম ।হালকা জোৎস্না, পরিষ্কার আকাশ -

গুণগুণিয়ে উঠি ' জোসনা রাতে সবাই গেছে বনে '

তারপরে -আকাশ ভরা সূর্য তারা -চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে ....

আমার স্টকে যে এত রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে এখানে না এলে জানতেই পারতাম না ।আজ আকাশে অনেক অনেক তারা । গোটা আকাশটাই যেন সলমা-চুমকি জড়িয়ে পেখম মেলেছে । অপার্থিব সৌন্দর্য্য -মনে পড়ে যায় পড়েছিলাম--

দিবস রজনী তন্দ্রাবিহীন

মহাকাল আছে জাগি

যাহা নাই কোনখানে

যারে কেহ নাহি জানে

সে অপরিচিত কল্পনাতীত

কোন আগামীর লাগি ।

চিন্তায় ছেদ পড়লো অনতিদূরে কয়েকজন তরুণের জোরালো কথপোকথনে । তড়াক করে লাফিয়ে উঠি । একেবারে ওদের সামনে গিয়ে বাংলায় বলি -

'দাদারা বাঙালী তাইনা ?'

ওদের মধ্যে যে সব থেকে কচি সে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে বললো -'আপনি কি করে বুঝলেন আমরা বাঙালি ?আমরা তো বাংলায় কথা বলছিলাম না ! '

মৃদু হাসলাম- বললাম ' আমার কেন যেন মনে হল !'

(আসলে ওদের রাজা-উজিড় মারা থেকে যে ব্যাপারটা টের পেয়েছি সেটা বেমালুম চেপে গেলাম।)

শুনলাম এরা ভূপর্যটক। দারুণ লাগলো। জীবনে ভূপর্যটক দেখিনি। বললাম - অ্যাফ্রিকা গেচেন ?

--হ্যাঁ।

--নেকড়ে দেখেচেন ?

--হ্যাঁ।

--সেকি মশাই অ্যাফ্রিকায় তো নেকড়ে নেই !

--কে বললে?

--কেন সোনার কেল্লা দেখেননি ?

--না তো ! আমরা হলাম গিয়ে প্রকৃতি প্রেমিক,কেল্লা-টেল্লা বেশি দেখা নেই।

আর কথা বাড়ালাম না - সোনার কেল্লা দেখেনি এ কেমন ভুপর্যটক থুড়ি বাঙালী গা ?

পরের দিন ঘরে ফেরার পালা। মাইশোর হয়ে আসবার সময় কয়েকটি উট চোখে পড়লো। অবশ্যি পোষা উট। মজা করে কর্তাকে বললাম-

উট সম্বন্ধে প্রশ্ন চলবে ?

কর্তা হতাশ গলায় বললেন-এখানেও সোনার কেল্লা ?

পাশ থেকে কে যেন পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলেন -' কেল্লা এদিকে অনেক আছে, তবে সোনার কেল্লা দেখতে হলে জয়সালমির যেতে হবে।

প্রায় চমকে উঠে বলি -'আপনি সোনার কেল্লা দেখেছেন ?'

সেই ভদ্রলোক --'আসলটা দেখিনি তবে নকলটা মানে ছায়াছবিটা ৩২ বার দেখেছি।'

বলে কি ! ৩২ বার ? শুনে আমার ৩২ পাটি আপনাআপনিই বেরিয়ে এলো।

পাহাড় লাগি আঁখি ঝুরে

Wanderlust রোগের একটি উপসর্গ হল - কিছুদিন গৃহবন্দী হয়ে থাকলেই হাঁপিয়ে ওঠা। পাহাড় লাগি আঁখি ঝুরে, তাই এবারে গন্তব্যস্থল সিকিমের কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চল। সিকিম, সিকিম, সিকিম - অর্কিড, রডোডেনড্রন ও বরফের দেশ। কলকাতার বুড়ি ছুঁয়েই তিস্তা নদীর ধার ধরে সোজা হিমালয়। একটি ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে আমার শহর থেকেই বুকিং সেরে এসেছিলাম। এরাই সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক থেকে পুরো ট্যুরটা কন্ডাক্ট করবেন।

গ্যাংটকের জব্বর শীতে রাতঘুম সেরে যখন উঠলাম কাঁচের জানলা দিয়ে পরিষ্কার হিমালয় দেখা যাচ্ছে। সুনীল আকাশে সাদা মেঘ, সূর্যের কিরণে পাহাড়ের চূড়াগুলো ঝালমল করছে। অপরূপ দৃশ্য। মুহূর্তে মনপ্রাণ দূষণ মুক্ত।

পেটভরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। যেতে হবে লাচেন। ঘন্টা ৬-৭ মতন লাগবে। আমাদের দলে ৬ জন। এর ভেতর ২ জন গাইড ও ড্রাইভার। লাচেন যাবার পথে মাঝখানে একটি জায়গায় লাঞ্চ সেরে নিলাম। ছোট্ট একটি পাহাড়ী হোটেল।নীলচেপাহাড়ের মেয়ে এসে সাজিয়ে দিল মোটা চালের গরম গরম ভাত, ডাল, সবজি, চিকেন কারি ও স্যালাড। পথশ্রমে ক্লান্ত আমাদের এগুলোই অমৃত মনে হল। পেট ভরে খেয়ে আবার যাত্রা শুরু। সন্ধ্যে নামার কিছু পরে পৌঁছলাম হিমগঞ্জ লাচেন এ। মাত্র কয়েকটি ঘর বাড়ি নিয়ে ছোট্ট পাহাড়ী জনপদ। দু- একটি হোটেল চোখে পড়লো। তাতে সব সাহেব-মেম রয়েছে। আমাদের নিজগৃহে আপ্যায়ন করলেন স্থানীয় সিকিমী পরিবার। আজ ও কাল আমরা এদের অতিথি। আমাদের ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে এরা চুক্তিবদ্ধ। দুটি পরিষ্কার আধুনিক কামরায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। গীজার পর্যন্ত আছে। সিকিম সুন্দরীর উষ্ণ অভ্যর্থনায় হিমদিন উষ্ণতা পেল।

এরা কি ক্রীম মাখে গো ? আপেলের মতন লাল টুকটুকে গালগুলো যে চকচক করে - প্রশ্নটা এলো আমাদের এক সহযাত্রীর কাছে থেকে । পাকদন্ডী বেয়ে চলেছি ডিনার খেতে,সঙ্গে আপেলসুন্দরী । নামছি তো নামছিই । নামা ওঠা করতে করতেই দেখি সব খাবার হজম হয়ে যাবে । যাইহোক অবশেষে এল ডাইনিং হল । পরিপাটি করে খাবার সাজানো । স্বাদ অপূর্ব । শুধু মাথা পিছু হিসাব করা । একটির বেশি দুটি ডিম মিলবে না, কারণ রেশন আসে গ্যাংটক থেকে । মিনারেল ওয়াটারের কোন দোকান নেই আশেপাশে । ঝর্ণার জলে রান্না, সেই জলই পেয় । পরিবেশ বিজ্ঞান পড়া মন খুঁতখুঁত করে । জলে না জানি কি দূষিত পদার্থ আছে । নিদেনপক্ষে অভ্রকণা, তা থেকে হিল ডাইরিয়া, হাসপাতাল - বেড়ানো বন্ধ মায় ভবলীলা সাঙ্গ । বিজ্ঞানমনস্ক ও কল্পনাপ্রবণ মন একজোট হয়ে ভয়াবহ রূপ নিয়ে আমাকে চেপে ধরেছে । আর সেই চাপে নাভিশ্বাস উঠছে ।

পরদিন কাকভোরে রওনা হলাম পবিত্র গুরুডোংমার লেকের পথে । ৩-৪ ঘন্টার পথ । দূর্গম । সদ্য পর্যটকদের জন্য খোলা হয়েছে । মাঝে মাঝে রাস্তা ভীষণ খারাপ । চারিপাশে আর্মির ঘাঁটি । প্রচুর বাঙ্কার চোখে পড়লো । ঘন্টাখানেক যাবার পর একটি ট্রেকার্স হাট মার্কা দুকামরার কাঠের বাড়িতে বসে সঙ্গে আনা ডিম-পাউরুটি খেয়ে নিলাম । অবশ্যই গরমা গরম সিকিম চা সহযোগে । এক অতি উৎসাহী জানালেন :: এই যে চা, এই চা চমরী গাইয়ের দুধ দিয়ে তৈরি । সত্যি -মিথ্যা জানিনা তবে রোমাঞ্চ হয় বইকি ! এরকম লোম খাঁড়া করা চা জীবনে খাইনি কিনা । আমার দৌড় ঐ গরু পর্যন্তই । ঘরের ভিতরে একটি প্রকোষ্ঠে কাঠ জ্বালানো হয়েছে । লেলিহান শিখা গনগন করছে । সকলে সেখানে আগুন পোহাতে ব্যস্ত । বাইরে তাপমাত্রা মাইনাসের ঘরে । রক্ত যেন হিম হয়ে যায় ।

আবার পথ চলার শুরু । দুপাশে অসংখ্য বরফের পাহাড় । অবশেষে এলো ধূ ধূ প্রান্তর । গাইড আগেই বলেছিল যে এদিকে মরুভূমি আছে, ভাবলাম ফাজলামো করছে । ১৮০০০ ফিট উচ্চতায় মরু ? কিন্তু নিজে চোখে দেখে অবিশ্বাস করি কেমন করে ? এ হল সাদা বালির এক অপরূপ কোল্ড ডেজার্ট । এক জায়গায় ইয়াকের কঙ্কাল পর্যন্ত চোখে পড়লো ।

গুরুডোংমার পৌঁছে আমার অবস্থা টাইট। এতই টাইট যে হওয়া চলাচল বন্ধ। শ্বাস কষ্ট হচ্ছে রীতিমতন। তেমনি হাড় কাঁপানো ঠান্ডা। বরফ ও বালির পাহাড়ে ঘেরা স্বচ্ছ দীঘির মনমাতানো রূপ উপভোগ করবো কি, পালাতে পারলে বাঁচি। নিচে থাকাকালীন আমাদের গাইড এক কুচি আদা মুখে রাখতে দিয়েছিল। এতে নাকি শ্বাস কষ্ট হবেনা। আমি রেখেও ছিলাম। কিন্তু পরে ফেলে দিই। রাস্তায় পড়ে আদার কুচিটা হ্যা হ্যা করে হাসছিল। তখন গুরুত্ব দিইনি। ভাবলাম :: এক সামান্য আদা, সে কি জানে ? পরে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি আদার প্রয়োজনীয়তা। আমাদের ডিগ্রিধারীদের নিয়ে এই এক মহাগোল। বইয়ে না পড়লে আমরা ঝট করে কিছু বিশ্বাস করিনা। নিজেদের সীমাবদ্ধতা অনেক সময় ভুলে যাই, নিজেকেই সব্বজান্তা ঠাওড়ে বসি।

এই গুরুডোংমার লেক নি:সন্তান দম্পতিদের জন্য এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এই পবিত্র জলাধারের গান্ধারীত্ব অর্পণের ক্ষমতা আছে বলে শোনা যায়। ভাগ্যিস খুব বেশি লোক এর কথা জানেনা। তাহলে বিপুল জনসংখ্যার চাপে কাহিল ভারত, মহাভারত হয়ে বিপত্তি ঘটাতো। স্থানীয় মানুষ এই জলকে গঙ্গার চেয়েও পুণ্যতোয়া বলে মনে করেন। এছাড়া আছে একটি কাঠের মন্দির। সর্ব ধর্ম সম্বনয়ের স্থান। ১৮০০০ ফিট উচ্চতায় যীশু, গুরুনানক থেকে শুরু করে আমাদের বড় আপন, স্বয়ং রামাকৃষ্ণ দেব পর্যন্ত হাসিমুখে উপস্থিত। চোখাচোখি হতেই মুচকী হসে বললেন : খপর পেলুম তুই আসছিস, তাই সুয্যির ভোল্টেজটা একটু কমিয়ে দিলুম।

আর এই ন্যাচেরাল এয়ার কন্ডিশনিং এ আমার দেহের সব নাটবল্টু জং ধরে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া অবস্থা। পাল্টা হেসে বললাম- এ কি করলা গা ঠাকুর ? আমারে একবার জিগাইলা না ? বিজ্ঞান- টিজ্ঞান পইড়া আইসি। এ কি যেমন তেমন জিনিস ? দুম কইরা কমাইয়া দিলা ? ওটা এক্স টু দা পাওয়ার অফ ৩৫ ইনটু ১ বাই কাপ্পা মিউ পরিমান কমাইতে হইতো।

দুজন কলকাতার ভ্রমণপিপাসুকে দেখলাম একটি মোটরবাইক ঠেলে ঠেলে পাহাড়ে উঠছেন। তাইনা দেখে একদল আর্মিম্যান খুব হাসছেন - হো হো হো, বঙ্গালী লাগতা হ্যায় ! এ বঙ্গালী লোগ সব জাগা পৌঁছ যাতে হ্যায় -

বলতে না বলতেই - দুম ! মোটরবাইক উল্টে গেছে । দুই বীরপুঙ্গব মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন ।

এই জায়গায় দুটি পাহাড় আছে, পাশাপাশি, রাজা ও রানী পাহাড় । আপাদমস্তক বরফে মোড়া এই দুই পাহাড়ে আজ পর্যন্ত বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কেউ চড়তে পারেন নি । সরকার থেকে মোটা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, তবুও ডেমোক্রেসী (রাজা-রাণী বিজয়) অধরাই থেকে গেছে । শোনা গেল এই দুই পাহাড়ের কোন বিশেষ ক্ষমতা আছে যাতে করে কেউ এতে চড়তে গেলেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন বা প্রাণ হারান । স্থানীয় মানুষদের কাছে এটা একটি মিথের মতন ।

ফেরার পথে দুই আর্মি জওয়ানকে আমাদের গাড়িতে লিফ্ট দিতে হল । বদলে মিললো এক ঝাঁক মিনারেল ওয়াটারের বোতল, যা কিনা আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে নিয়ে নিলাম । পেয়ে ভারি খুশী - যাক বাবা বাঁচা গেল, ওসব ঝার্ণা - ফর্ণার জল নিয়ে কাব্যি করাই চলে, পান করে বেঘোরে প্রাণটা যাক আর কি ! এখনও তো ২৫টা সোনাঝুরিই বেরোয়নি !

ফেরার পথে চোপতা ভ্যালি । বিশেষ কিছুই চোখে পড়লো না । কেবল মানুষ আর ঘোড়ার মেলা । সাদা ঘোড়া, কালো ঘোড়া, লাল মানুষ, হলুদ মানুষ । কাজেই লাচেন পৌঁছে অসাধারণ চিকেন কারি সহযোগে ভোজনপর্ব সারলাম । এবার যাবো লাচুং, সারা রাস্তায় অজস্র হেয়ার পিন বেন্ড । বাঁকে বাঁকে কেমন গা গুলিয়ে ওঠে । বদলে যাচ্ছে দৃশ্যপট, হিমালয় নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ করছে । ঘন্টা ৩-৪ লাগলো । লাচুং চু নদীর তীরে আমাদের হোটেল । চু মানে নদী । কলকল ধ্বনি শুনতে শুনতে কাটে সন্ধ্যে । অচেনা পাহাড়ি ফুলের গন্ধে আমার রজনীগন্ধাগুলো হয়ে যায় এক একটি পারিজাত । ডিনার সেরে পারিবারিক আড্ডা । অসম্ভব শীত । পরদিন প্রত্যুষে পাহাড়ের শোভা দেখতে দেখতে চুয়ের তীরে চা পান । সবথেকে কাছের পাহাড়ে বরফ লেগে আছে । মনে হচ্ছে কেউ যেন রূপো দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে । বেলা বাড়ার সাথে সাথেই সেই বরফ গলে জল । লাচুং চু নদীতে তখন রূপো ঝরছে । রডোডেনড্রন বন, চড়াই- উৎরাই পেরিয়ে আমরা ইয়ুমথাংয়ের পথে । পথের নৈসর্গিক শোভায় বাকরুদ্ধ হয়ে গেছি । পাথরের গায়ে লাল লাল শ্যাওলা, ধ্বসচিহ্ন, নীলাভ নদী কলস্বনা,

বাতাসে পাইনের গন্ধ, সার বেঁধে চলেছে ইয়াক, মিলিটারি ট্রাকের ভারী আওয়াজ নৈ:শব্দকে চূর্ণবির্চূন করে দিচ্ছে । পর্বতাভিযানের গতিশীলতা নিরস শহুরে মনে রোমাঞ্চ আনে । ঘন বনে ছায়া ঘনায় । মাথার ওপরে সবুজ ছাউনি থাকলে বৃষ্টি বড় একটা গায়ে লাগেনা ।

এসে গেল ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স ইয়ুমথাং । ভারতের সুইজারল্যান্ড । আসল সুইজারল্যান্ড যেহেতু আমার দেখা আছে তাই ভারতের সুইজারল্যান্ডে কয়েকটি মাত্র ঘাসফুল দেখে বড়ই আশাহত হলাম । বড় অসময়ে এসেছি ইয়ুমথাং । এপ্রিলে বা তারও পরে এখানে মায়াকানন তৈরী হয় । ফুলে ফুলে ভরে যায় পাহাড়ি উপত্যকা । ভগ্ন হৃদয়ে ন্যাড়া ইয়ুমথাংকে বিদায় জানিয়ে রওনা হলাম জিরো পয়েন্টের উদ্দেশে । সেখানেই রাস্তা শেষ, বাকি পথ যেতে হলে ইয়াকের পিঠে চড়া ছাড়া উপায় নেই ।জায়গাটার নাম ডোকেয়ালা ।

হোটেলে ফিরে একটা সিয়েস্তা সেরে আশেপাশটা ঘুরে নিলাম । একটাও ওষুধের দোকান নেই । নেই মোবাইল কানেক্শন । যারা উঠতে বসতে মোবাইল কানে ফিসফাস করেন তাদের সমূহ বিপদ । আধুনিকতার একেবারে ঐ প্রান্তে এই পাহাড়ী রাজ্য । সভ্যতা যেমন নেই তার বিষ ও নেই । আছে আদিমতা, সরলতা, প্রাণখোলা হাসি যা লাখ টাকা খসালেও শহরে মিলবে না । যেন হাসার জন্যে এরা ওৎ পেতেই আছে । চোখাচোখি হতেই ৩২ পাটি বেরিয়ে পড়ছে । হাসতে হাসতে চোয়াল ব্যাথা হয়ে গেল আমার – বাবরি বাব !

পরদিন কাকভোরে কুয়াশার আঁচল কেটে গেলাম সোজা গ্যাংটকের হেলিপ্যাডে । সিকিম টুরিজমের একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে যাবো শিলিগুড়ি ।যদিও হেলিকপ্টারের পাখা মাঝ পথে বন্ধ হলে তিস্তার জলে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পড়বো সেটা মনে হতেই আমি ভয়ের চোটে বেঁকে বসি । এক ঝাঁক আর্মি ও এয়ারফোর্স অফিসারের পরিবারের বধূ আমি হঠাৎ নিজেকে খুব অযোগ্য মনে হল । কর্তা বললেন – এতো প্লেনে চড়ো কৈ ভয় পাওনা তো ! মনে মনে বলি –আরে বাবা প্লেনের তো এরকম উটকো একটা পাখা নেই, আমাদের গাইড অবশ্য বললো – ম্যাম, এইভাবে পাখা থামে না, ওরা রেগুলার বেসিসে মেনটেইন করে (ভ্যাগিস বললো) আমি হাঁফ ছেড়ে

বাঁচলাম । কারা যে এইগুলো বানায় ! শুধু শুধু ভয় পাইয়ে দেওয়া । গট গট করে চড়ে বসলাম হেলিকপ্টারে । তারপর শুধুই মধুবর্ষী যাত্রাপথ । চারিপাশ থেকে পাহাড় গুলো আমাদের জাপটে ধরছে । ল্যাম্পপোস্ট গুলো চিরুনীর দাঁড়ার মতন, তিস্তা নদী রূপালী রেখা, সেবক ব্রীজ রুলারের মতন, গ্যাংটক ও শিলিগুড়ি শহরটা কোন স্থপতির মডেল । সবুজ সবুজ ধানক্ষেত গুলো যেন এক একটা ভেলভেটের টুকরো । অপরূপ সেই দৃশ্য । অনেক ছবি তোলা হল । দু চোখ ভরে স্পঞ্জের মতন সব টুকু রস শুষে নিলাম আমি । সময় মতন নামলাম বাগডোগরা এয়ারপোর্টে ।

হিমালয়ের রূপে অবগাহন সেরে এবার কলকাতা ফেরার পালা । তার আগে দেখা হল একদল মানুষের সঙ্গে, তাঁরা সর্বত্যাগী । চলেছেন অমৃতের পথে, হিমালয়ের গুহামুখে । জাগতিক সব কিছুকে হেলায় ফেলে চলেছেন শাশ্বত সত্যের সন্ধানে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে নয়, অর্ন্তমুখী অভিযানে । সব পেয়েও আজ, মোক্ষের খোঁজে ফেরে অমৃত মানব ।

আমরা জলপাইগুড়িতে কিছু সময় কাটিয়ে ফিরি কলকাতায় । গ্রামীণ মানুষের মাঝে অনেক দিন পরে একটি সুন্দর পুজো কাটে ।নাড়ু, তিলতক্তি, মুড়কি দিয়ে হয় বিজয়া । পিংজা, পাস্তা খাওয়া মুখে আমার কাছে এর স্বাদ অতুলনীয় ।

একটা কথা বলা হয়নি, লাচুং থেকে গ্যাংটক আসবার সময় কাঞ্চনজঙ্ঘার সঙ্গে গা ঘষাঘষি করে এলাম অনেকটা পথ । অপূর্ব সূর্যোদয় দেখলাম । বরফসাদা থেকে তামাটে, তামাটে থেকে স্বর্ণাভ । ভাষায় প্রকাশ করা আমার অসাধ্য । জানি এই অনন্য অভিজ্ঞতা জীবনের অনেক একঘেয়ে মূহুর্তকে রঙীন করে দেবে । যদিও তুষারজুড়ে ময়ূখমালীর খেলা দেখতে দেখতে আর ফিরতে ইচ্ছাই করেনা । মনে হয় এখানেই বেরিয়ে যাক শেষ নি:শ্বাস আমার ।।

মনমে মানসী মুন্নার

এখন আমি বসে আছি সবুজ সবুজ চা বাগানের ঠিক মাঝখানে । আমার একদিকে কুলকুল করে বয়ে চলেছে একটি ঝোরা -

দূরের পাহাড়ে রঙ লেগেছে । ধূসর থেকে নীলাভ, পেস্তা থেকে গাঢ় সবুজ।শত শত পাহাড় ডিঙিয়ে আমরা আপাতত: সবুজের দেশ কেরালার এক ছোট্ট শৈলশহরে-নাম তার মুন্নার ।

মুন মানে তিন ও ***আর*** মানে নদী -অর্থাৎ মুন্নার মানে তিনটি নদীর মিলন ক্ষেত্র।আমরা চিন্নাকানাল নামে একটি জায়গাতে 'ক্লাব মহীন্দ্রার'-রিসর্ট এ আছি ।

আমি বসে আছি রিসর্টের বারান্দায় । নিচে চা বাগানে একে একে জড়ো হচ্ছে মহিলা কর্মী রা।পিঠে বড় বড় ঝুড়ি বাঁধা ।আমার ডাইনে একটি সরু রাস্তা ।ফুলে ফুলে ঢাকা সে পথ । সেই পথে সার বেঁধে চলেছে নানান গাড়ী ।

এখান থেকে মনে হচ্ছে যেন এক একটি দেশলাই বাক্স পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছে !

পাঁচতারা এই রিসর্টখানা ভারি সুন্দর । চিরাচরিত সব ব্যবস্থা ছাড়াও আছে প্রখ্যাত 'কেরালা আয়ুর্বেদের' একটি মাসাজ কেন্দ্র । আর আছে খেলাপাগলদের জন্যে একটি 'মিনি গলফ কোর্স'। এদের 'টি রুম' নামক রেস্তোরাঁ টি তে বসলে বাইরে সুন্দর দৃশ্য দেখা যায় । পর পর পর্বত শ্রেনী ধূসর থেকে ধূসরতর হয়ে গেছে।দূরে একটি লম্বাটে প্রাকৃতিক জলাধার ।যার একটি পার কুয়াশায় ঢাকা।জানা গেল পাহাড়ের ঐদিক টা সব সময় কুয়াশা মাখা থাকে ।

মুন্নারের আশেপাশে বেশ কিছু দেখার জায়গা আছে।

কিছু দেখা যাবে, কিছু বৃষ্টির জন্য বন্ধ ।কয়েকটি হল :

পেরিয়ার ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙচুয়ারি, এরাভিকুলাম স্যাঙচুয়ারি, মাডুপট্টি ড্যাম,চিন্নার ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙচুয়ারি, দেবীকুলাম, কোল্লুকুমালাই ও গুদামপাড়াই জঙ্গল এবং স্পাইস প্লানটেশন ।

এর ভেতর আমরা কোল্লুকুমালাই ও গুদামপাড়াই জঙ্গল যেতে পারিনি বন্ধ ছিল বলে। আর দেবীকুলাম ও চিন্নার দেখা হয়নি সময়াভাবে ।

প্রথমদিন আমরা রিসর্ট এর মধ্যেই কাটাতে বাধ্য হলাম। কারন সেদিন মুন্নার 'বন্ধ' ছিল। কোন এক ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে কেউ খুন করেছে -তাই এই বন্ধ । মৃত্যু সব সময় দুঃখের । কিন্তু তার জন্য সবার সব আগাম প্ল্যানকে বুড়ো আঙুল দেখানোও সমান দুঃখের ।

আমাদের মুন্নার ভ্রমণ শুরু হল দ্বিতীয়দিন 'থেকড়ি' বা 'থেক্কাডি' ভ্রমণ দিয়ে ।ত্রিবাঙ্কুর মহারাজা পেরিয়ার নদীর বন্যার জল অরন্যের মধ্যে বইয়ে দেন - ফলস্বরূপ ১৯৩৪ সালে একটি লেকের সৃষ্টি হয় ।সেই লেকটিকে ঘিরেই এই বন্যপ্রানী সংরক্ষণ কেন্দ্র 'পেরিয়ার '-লেকটি বিশালাকৃতি ।অনেকটা নদীর মতন ।মধ্যে মধ্যে কিছু গাছের কঙ্কাল সার বেধে দাড়িয়ে আছে ।তার ওপর অনেক নাম না জানা পাখি বাসা বেধেছে।লেকটির বুকে ভাসমান দোতলা স্টিমার বা স্পীডবোটে করে পশুকুল কে দেখতে যেতে হয়।কোন ঘাটে আসে হাতি কোথাও সম্বর বা বাইসন অথবা ভালুক কিম্বা বুনোশূয়োর । এছাড়া হরিণ বা বাঁদর তো আছেই ।এটি ব্যাঘ্রপ্রকল্প হলেও আমরা বাঘ দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলাম ।

৬৫০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত রাজামালাই নামক একটি জায়গাতে আছে 'এরাভিকুলাম স্যাঙচুয়ারি ' -এখানে কুয়াশা মাখা পাহাড়ের ঢালে ও সবুজ উপত্যকায় চড়ে বেড়ায় 'নীলগিরি থর ' বা মাউন্টেন গোট -এরা লুপ্তপ্রায় প্রজাতি ভুক্ত । মাত্র ২৫০০ এর কিছু বেশি অবশিষ্ট আছে ।তারা এই উপত্যকায় চড়ে বেড়ায় ।

আমরা একদলকে দেখলাম ঝর্ণার ধারে কচি ঘাসের ওপর অলস ভাবে সময় কাটাচ্ছে ।

এরপর গেলাম মাডুপট্টি ড্যাম দেখতে ।সুবিশাল লেকের ওপর এই ড্যামটি।অনেকে এই জায়গা টিকে 'সেমি আল্পস ' আখ্যা দিয়ে থাকেন ।৫৬০০ ফুট উঁচু এই স্থানে আছে চমৎকার সবুজ সবুজ উপত্যকা ।অনেকটা আল্পসিয় বনভূমির মতন । সেই থেকেই এই নাম করন ।সে সব উপত্যকায় মাঝে মাঝে আসে বুনো হাতির পাল । আমরা অবশ্য দেখতে পেলাম না ।কারন প্রচন্ড বাজির আওয়াজে (পুজো) ওরা ইদানীং আসা বন্ধ করে দিয়েছে ।এখানে একটি ইন্ডো-সুইস ডেয়ারি ফার্ম আছে । সেখানে ১০০ প্রকার **হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি** গোপালন করা হয়।এর অনতি দূরেই (১ কিমি) আছে একটি ইকো পয়েন্ট । জায়গাটি ভারি সুন্দর ।

পাহাড়িয়া পথে দাড়িয়ে নিজের কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাবেন ।

মাডুপট্টি অঞ্চলে ঐ লেকটিতে বোটিং করার ব্যবস্থা আছে ।কেউ স্পীডবোট নেন কেউ বা সাধারন নৌকো । আমরা স্পীডবোট করে সারা লেক চষে বেড়ালাম ।প্রচন্ড গতিতে সর্পিলভাবে আমরা যখন প্রতি টি পাহাড়ের পাদদেশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিলাম আমার নিজেকে সবুজ দ্বীপের রাজা ছবির কালো পাঞ্জার মতন মনে হচ্ছিল ।

যে দুটি জায়গা দেখা হয়নি তার ভেতর আমরা মুন্নার আসবার সময় একটি পেরিয়ে এসেছিলাম ।সেটি চিন্নার স্যাঙচুয়ারি-এটি মুন্নার থেকে ৭০ কিমি দূরে । আসবার সময় কিছু ত্রস্ত ময়ূর ও মৃগ কে দ্রুতবেগে বনপথ পেরোতে দেখে খুব ভালো লেগেছিল।তখন জানা ছিল না যে এখানে আসা হবে না ।এই অরন্যে হাতি,ভালুক ইত্যাদি ছাড়াও অন্য আকর্ষণ 'রেয়ার বার্ডস' পর্যায়ভুক্ত স্পটেড ডাভ,কেরালা লাফিং থ্রাস ইত্যাদি।এদের বাংলা নাম না জানায় বিভ্রান্তি এড়াতে আমি ইংলিশ নাম গুলি লিখলাম।আর আছে 'স্টারড টর্টয়েজ '-

হাতে সময় নিয়ে এসে পরে কখনো দেখা যাবে -

দেবীকূলম এর অর্থ দেবীর পুষ্করিনী ।ছবির মতন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যপটে আছে একটি শান্ত,স্নিগ্ধ জলাশয়- নাম তার 'সীতা দেবী '-উপকথা অনুযায়ী দেবী সীতা রোজ সকালে এখানে স্নান করতে আসেন ।এখান থেকে ট্রেক করে 'লেমন গ্রাস ' প্ল্যানটেশনে যাওয়া যায় ।প্রানভরে লেমন গ্রাসের সুবাস নিয়ে এগিয়ে চল কোন দুধসাদা ঝর্ণার খোঁজে !

চিন্নার ও দেবীকুলাম না দেখার কষ্ট অনেকাংশে লাঘব হয়ে গেল মাডুপট্টি থেকে ফেরার সময় 'স্পাইস প্লানটেশন ' দেখে ।এলাচ ক্ষেত জীবনে প্রথম দেখলাম । আনন্দ তো হবেই ! গাছের গোড়ায় সবুজ সবুজ কচি এলাচ হয়ে আছে ।থোকা থোকা । ছিঁড়ে নিয়ে শুকে দেখলাম -কৈ নাহ ! সুন্দর গন্ধ তো নেই !তাতে কি? নতুন একটা অভিজ্ঞতা হল তো -মন্দ কি !

কেরালা কে তার রূপের জন্য বলা হয় **গডস ওন কান্ট্রী** - সেরকম মশলাপাতির জন্যেও এর যথেষ্ট নাম ডাক আছে।এলাচ ক্ষেত পরিদর্শন সেরে আমরা সিলভার ওক আর কমলা লেবু গাছের ছায়া ঢাকা পথ ধরে চলে গেলাম চা বাগানের দিকে । দূর থেকে মনে হচ্ছিল বাগান গুলি এক একটি কাছিম - আকৃতি গুলি ঠিক কচ্ছপের পিঠের মতন ।ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়লো 'চা গাছ' গুলি লাল লাল ঝরা ফুলে পুরো ঢেকে গেছে-প্রচুর মহিলা কর্মী পিঠে বড় বড় ঝুড়ি নিয়ে দুটি পাতা একটি কুঁড়ি তুলতে ব্যস্ত ।সকলের পরনে সুন্দর ঝলমলে রঙীন জামাকাপড় ।বিকেলের মরা আলোয় সিলভার ওক গাছ থেকে ' রূপো ঝরে ঝরে ' পড়ছে । আমার প্রকৃতিপ্রেমী মন উচাটন হয়ে ওঠে এইসব দেখে ! আমরা ওদেরকে নানান প্রশ্ন করছিলাম

আমাদের ভাষায় -ওরা উত্তর দিচ্ছিলো ওদের মতন করে ওদের ভাষায় । সে এক ভারি মজার ঘটনা-

শুধু এই টুকু বেশ বুঝলাম যে হৃদয় সুধা মিশিয়ে কথা বল্লে মালায়ালামের মতন খটমট ভাষাও শ্রুতিমধুর মনে হয় । ওদের সরল হাসি দেখে মনে পরে গেল বহুবার পড়া সেই লাইন কটি 'জগৎ জুড়িয়া আছে এক জাতি, সে জাতির নাম মানুষ জাতি '-

বিজয়া দশমীর রাতে 'ক্লাব মহীন্দ্রার' বাঙালী 'শেফ' এর বিশেষ অনুরোধে আমরা কিছু 'এক্সোটিক ' বাঙালী খানা দিয়ে ভুড়িভোজ সারলাম।মা দূগ্গা চলে গেলেন আমরাও একাদশীর ভোরে চন্দন বনের গন্ধ মেখে গৃহাভিমুখে রওনা হলাম । মনটাকে ঝরঝরে তাজা করে নিয়ে । কর্মজীবনের ব্যস্ততায় ফিরতে হবে যে !

নীল নির্জনে

নীল পাহাড় অনেকদিন ধরেই ডাকছে । যাবো যাবো করেও যাওয়া হচ্ছিল না । হঠাৎই সুযোগ এসে গেল ।একদিন প্রত্যুষে র'ওনা হলাম দক্ষিণ ভারতের ' কুইন অফ হিলস্টেশান ' উটির উদ্দেশ্যে । তামিলনাড়ু রাজ্যে, নীলগিরি পাহাড়ে ২২৪০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত উটাকামুন্ড বা উধাগামন্ডলম্ --আদর করে বৃটিশরা যার নাম দিয়েছিল 'উটি' ।

এক বৃটিশ কালেকটর, জন সুলিভান প্রথম এই শৈলশহরটি আবিষ্কার করেন ও একে তাদের গ্রীষ্ম কালীন ছুটি কাটাবার স্থান হিসাবে গড়ে তোলেন ।

তার আগে উটি ছিল টোডা সম্প্রদায়ের বাসভূমি ।রহস্যাবৃত,কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটি পাহাড়ী রাজ্য ।

আমরা ক্লাব মহীন্দ্রার 'ড্যানিশ ভিলা ' তে উঠেছিলাম ।

এখন অন্য কোনো ভিলা ওরা ব্যবহার করেন । ১৭০ বছর আগে একজন ড্যানিশ কালেকটর এই ভিলাটি নির্মাণ করেন । পরবর্তী কালে বৃটিশেরা এটি দখল করে নেয় ।১৯৪৭ সালে মহীন্দ্রা অ্যান্ড মহীন্দ্রা কোম্পানী এই সুন্দর ভিলাটি কিনে নেন ।আপাতত: এটি আমাদের মতন ভ্রমণপ্রেমীদের অবসর বিনোদনের জায়গা ।

প্রথমদিন ব্রেকফাস্ট খেয়ে গেলাম ৩৫ কিমি দূরে কোটাগিরি ও কোডনাড নামে দুটি জায়গাতে। পাশাপাশি দুটি গাঢ় নীল পাহাড়ের চূড়া দেখে তার মাঝখান দিয়ে যাবার সময় কালিদাসের উপমা মনে পড়ে -

'মধ্যে শ্যাম: স্তন -ইব ভুব:' -

কোটাগিরি ও কোডনাড --দুটি জায়গাতেই প্রচুর চা বাগান ও টি-ফ্যাক্টরি আছে ।আমি আবার চা-য়ের একজন "connoisseur` বলে নিজেকে মনে করি কাজেই চা বাগিচা আমার কাছে অন্যতম আকর্ষণ ।

বেশ কয়েকপ্রকার চা পাতা টেস্ট করে দুটি বিশেষ ধরনের পাতা কিনে র'ওনা হলাম গোলাপবাগ দেখতে । ২০০০টি বিভিন্ন প্রজাতির গোলাপ ফোটে এই বাগানে । ভারতবর্ষের আর কোথাও এই জিনিস নেই । এছাড়া বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখলাম । ১৮৪৭ সালে "Marquis of Tweedale ` ৫৫ একর জমি নিয়ে এই উদ্যান তৈরী করেন । সবুজ

গালিচা মোড়া এই বাগানে ২০ মিলিয়ন বছরের পুরনো একটি গাছের ফসিল আছে । আর আছে ফার্ণ, অর্কিড ইত্যাদির সমারোহ । এই বাগানে এসে গাছপালার অনেক কঠিন কঠিন বৈজ্ঞানিক নাম শিখলাম । মাঝে মাঝে পাইন-ওক গাছেদের ঐ নামে ডেকেও ফেলছিলাম ।

পরেরদিন ঊষসী ঊষা তার কুয়াশা আঁচল খোলার আগেই,জ্যোৎস্না

স্নাত শিশির গায়ে মেখে গেলাম ২১ কিমি দূরে পাইকারা লেক দেখতে । এটি উটি-মাইশোর হাইওয়ের ওপরে অবস্থিত । সেখানে Wenlock Downs' নামে একটি বিশাল বনভূমি আছে । দারুণ দৃশ্য চারিপাশে । অনেক সিনেমার শুটিং হয় ওখানে ।পাইকারা লেকের পাড়ে যেতে হলে অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হয় । সবুজ সবুজ গাছের ছায়া মাখা পথ ধরে, পাখিদের গান শুনতে শুনতে মন্দ নয় সেই প্রকৃতির কোলে হারিয়ে যাওয়া ।একঘেয়ে, মরচে ধরা সম্পর্কে এক ঝলক তাজা বাতাস আনবে এই পথ চলা ।

একটি জায়গা চোখে পড়লো, বহু মানুষজন দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে - কি ব্যাপার না ৮০'র দশকের সুপার -ডুপার হিন্দী ছবি ' ত্রিদেবের' হিট গান ' ওয়ে ওয়ে'র পিকচারাইজেশন হয়েছিল ওখানে ।

কয়েকজনকে 'ওয়ে ওয়ে - ওয়ে ও হো আ-'

করে নাচন -কোদন করতেও দেখলাম । সেই গগনভেদী চীৎকার নীরব বনমর্মরকে ছিন্নভিন্ন করে দিল ।

দোডাবেট্টা হল নীলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ । এর উচ্চতা ২৬২৩ মিটার । এটি উটি থেকে ১০ কিমি দূরে । আমরা যখন এই শৃঙ্গে চড়লাম তখন চারিপাশ কুয়াশাচ্ছন্ন । কিছুই দেখা গেলনা । শুধু বহু দূর থেকে ঘোড়ার খুড়ের 'খটখট' শোনা গেল । খুব দু:খ হল । কারন আগেও আমি এই শৃঙ্গে অনেক আশা নিয়ে চড়েও কিছুই দেখতে পাইনি, একেবারে খালি হাতে নেমে এসেছি । আমার কপালে মনে হয় এই শৃঙ্গ থেকে উটিদর্শন নেই ।

কুনুর,নীলপাহাড়ের কুয়াশা মাখা একটি পাহাড়ী শহর ।বেগুনী ভোর,

লাল Poinsettia, পান্না রং এর চা - বাগিচা, সোনালী সূর্যমূখী সব

মিলিয়ে কুনুর এক স্বপ্নের দেশ ।

উটি থেকে কুনুর একটি টয় ট্রেন যায় । প্রকৃতির কোল ঘেঁষে খুব সুন্দর রুট দিয়ে এই ট্রেনটি যায় ।বনপথ ধরে যেতে যেতে অনেক ঝোরা, রং-বেরং এর প্রজাপতি ও পাখির সাথে কথা হবে ।

অবশেষে বনফুলের গন্ধ মেখে পৌঁছে যাবেন কুনুর ।

যাত্রাপথেই ৯কিমি দূরে পড়বে কেট্টি ভ্যালি । এটি বিশ্বের বৃহত্তম ভ্যালি গুলির মধ্যে অন্যতম ও কোয়েমবাটোরের সমতলভুমি থেকে মাইশোরের মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ।এছাড়া কালহট্টি জলপ্রপাত উটি থেকে মাত্র ১২ কিমি দূরে । ১৩১ ফুট উচ্চতা থেকে ঝরে পড়ছে জলধারা ।

জন সুলিভান ১৮২৪ সালে একটি কৃত্রিম লেকের সৃষ্টি করেন । নাম তার ‘উটি লেক’ - খুব সুন্দর - মনভালো করা জলাধার । ফুরফুরে বাতাস আর তাজা ফুলের সুবাস সবকিছু মিলিয়ে ভারি চমৎকার লাগে উটিলেক।

একটি রেসকোর্স দেখলাম, ২.৪ কিমি লম্বা ও ভারতের নামী রেস কোর্স গুলির মধ্যে অন্যতম ।

নীলগিরির নামকরণ সর্ম্পকে যদিও কিছু জানা নেই তবুও মনে হয় দূর থেকে পাহাড়গুলি নীলাভ মনে হয় বলেই এর নামটি নীলগিরি । আবার কুরিঞ্জী ফুল ১২ বছরে একবার ফোটে । এই ফুল এর রং নীল । এই ফুল প্রস্ফুটিত হলে দূর থেকে পাহাড় গুলিকে নীলাভ মনে হয় ।

তাই হয়তো এই গিরিশ্রেণী কে নীলগিরি বলা হয় ।

জিওলজিস্টেরা সঠিক কারন বলতে পারবেন ।

৩য় দিন আমরা গেলাম "Avalanche point` দেখতে ।

উটি থেকে ২৬ কিমি দূরে এই জায়গাটিতে ১৮২৩ সালে একটি তুষারধ্বস নামে । তারপর থেকেই এই জায়গাটির এরকম নাম । জায়গাটির একপাশে ঘন জঙ্গল । অন্য পাশে আছে ট্রাউট মাছের ভেড়ি । বড়শি-টড়শি ভাড়া পাওয়া যায় । অনেকেই ‘মৎস্য মারিয়া খাইবো সুখে’-র আশায় বড়শি ভাড়া নিচ্ছেন বলে চোখে পড়লো ।

উটিতে সর্বপ্রথম চা বাগানটি তৈরি করে এক স্কটিশ কোম্পানী, মেসার্স জেমস লিমিটেড ।সালটা ছিল ১৮৯৫ । আজ এই শৈলশহরটি শত শত চা বাগানে মোড়া ।

নীলগিরির পাদদেশ থেকে উটি যাবার দুটো রাস্তা আছে ।একটি চমৎকার পাইন -রডোডেনড্রন বনের মধ্যে দিয়ে, অন্যটি পাহাড়কে জড়িয়ে ধরা ৩৬টি হেয়ার পিন বেন্ড দিয়ে ।

সাধারণত লোকজন একটি দিয়ে যান, অন্যটি দিয়ে ফেরেন ।আমরাও সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুদুমালাই ফরেস্টের ভেতর দিয়ে যাবার সময় দেখি সার দিয়ে হরিণেরা রাস্তা পার হচ্ছে ।

বনহরিণীর চকিত চাউনি দেখে আমাদের ভেতর এক অতি উৎসাহী গান ধরলো : **কে তুমি বনহরিণী** ? ---

সুরটা শুনে বললাম যে এটা --কে তুমি তন্দ্রাহরণী - হবে । তাতে সে একটু লজ্জা পেয়ে গেল । বললো ' একটা গাইলেই হল - কি গেল-এলো হরিণী আর হরণী তে? মনে মনে হাসলাম ।ওর পেশাটাই যে ম্যানেজমেন্ট।

হঠাৎ দেখলাম একটি বনবেড়াল একটু দূরে বসে রোদ্দুর পোহাচ্ছে ।

আমাদের গাড়ী আসতে দেখে খুব বিরক্তির সঙ্গে একটু আড়চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে সুড়ুৎ করে বনে সেঁধিয়ে গেল ।

একটু পরে অন্য দৃশ্য দেখে খুব মজা লাগলো । এক হস্তিনী তার দুধের শিশুকে নিয়ে রাস্তার ধারে অপেক্ষা করছে । মনে হয় রাস্তা ক্রস করতে চায় । ছানাটি আমার দিকে পিটপিট করে চাইছে, বোধহয় একবার ফিক করে হেসেও দিল ! এতো লোক থাকতে কেবল আমার দিকেই চায় কেন বোঝা ভার- গায়ের বুনো গন্ধটা কি মোটেই যাবে না ?

শীতের দাপটে জঙ্গলের গাছপালা প্রায় নেড়া । দু-একটি গাছে দেখলাম মিষ্টি গোলাপী অথবা গাঢ় হলদে ফুলেফুলে ছেয়ে আছে । একটিও পাতা নেই তাতে । খুব ইচ্ছা ছিল সোনাঝুরির জন্য দৃশ্যটি ক্যামেরাবন্দী করার । কিন্তু হাতিপরিবারের তাড়া খাবার ভয়ে গাড়ী থেকে নামা গেল না ।

আরো কিছুদূর গিয়ে দেখলাম ' পাতাঝরা গাছে আগুন রং এর ফুল । মনে হচ্ছে যেন দাবানল লেগেছে -

নেচারের, কালার কম্বিনেশান অসাধারণ !

প্রকৃতির স্টুডিওতে কত নিপুন হাতে চলে সবকিছু - কোথাও বেখাপ্পা রং নেই । নেই কোন রং এর দৃষ্টিকটূ ব্যবহার ।কে করে, কেন'ই বা করে জানা নেই । আমার শিল্পী সত্ত্বার এটাই উপলব্ধি ।

সেই অদৃশ্য শিল্পীর জন্য এখানে একটি প্রণাম রেখে গেলাম । ভিলার ব্যালকনিতে বসেও দেখা যায় সেই চোখজুড়ানো রং এর বাহার । নীল পাহাড়কে পেছনে রেখে - হরেকরকমবা রং এর খেলা ।

যত দিন গড়াতে থাকে দূরের পাহাড়ে রং পাল্টাতে থাকে ।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে ।

আমি ড্যানিশ ভিলায় - একটি স্প্যানিশ কবিতার ব'ই খুলে বসি ।

যদিও অনুবাদ করা কবিতা ! অনুবাদ করেছেন সুব্রত বসু ।

প্রখ্যাত স্প্যানিশ কবি '**-হোর্হে লুইস বোরহেস**-এর লেখা কবিতা,

La tarde -

বাংলায় নামকরণ হয়েছে -সন্ধ্যা ।

সন্ধ্যা

যে সন্ধ্যা গুলো চলে গেছে বা যারা আসবে

আশ্চর্য রকম ভাবে সব এক হয়ে গেছে ।

স্বচ্ছ কাঁচের মতন একাকী, বিষন্ন

সময় বা বিস্মৃতি যেখানে অগম্য ।

আয়নায় ছবি সেই শাশ্বত সন্ধ্যার

যা থাকে এক গুপ্ত আকাশের ভিতর ।

সে আকাশে আছে মাছ, আছে ঊষা, তার

আছে তুলাদন্ড, তরবারি,জলাধার ।

সবকটি আদিরূপ'ই যা প্লোতিনো শেখায়

তাঁর লেখা নয়টি ব'ইয়ের পাতায় ।

হতে পারে আমাদের জীবন অনিত্য,

হতে পারে তা দেবতার খেয়াল মাত্র

তবু বাড়িটাকে ঘিরে নামে আদি সন্ধ্যা,

অতীত, বর্তমান ও অনাগত সন্ধ্যা ।

পরের দিন সকালে আমাদের ভিলার গেটের সামনে যে বিশাল ওক গাছটি আছে তার ছায়ায় বসে গরম চা পান করতে করতে একটি নীলপাখিকে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। মনের আনন্দে সে জানালার কার্ণিশে লম্ফঝম্ফ করছে ।মাঝে মাঝে অদ্ভুত সুরে ডাকছে । এই এক রত্তি পাখির কি অফুরন্ত জীবনীশক্তি !

ভাবতে ভাবতেই দেখি ফুরুৎ করে পাখিটি পালালো ।

আমিও গুটিগুটি পায়ে আমার ঘরমুখো রওনা হলাম।

আজ সন্ধ্যাবেলা Bonfire হবে - এই হাই অলটিটিউড এ সাঁঝবেলায় যথেষ্ট ঠান্ডা থাকে । কাজেই আগুন পোহানোর আইডিয়া মন্দ নয় ! ভিলার পেছনে মৌন নীলপাহাড়, একপাশে মুখর জলস্রোত আর অন্যদিকে গভীর খাদ । যদিও সেইদিকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ফুটে আছে নাম না জানা রং-বেরং এর বনফুল ।

শতাব্দী প্রাচীন এই ভিলায় কি ভূত আছে ?

জীবনে বহুবার ভূত দেখার জন্য ব্যাকুল হলেও আজ অবধি একটাও চোখে পড়েনি । যদিও জ্যান্তভূত অনেক দেখা আছে !

তাদের কয়েকজন কে আবার নতুন করে পেলাম Bonfire এর সময় ।

ঠিক গুপী গাইন - বাঘা বাইনের ভূতেদের মতন নাচানাচি করছে ।

পরের দিন তুলতুলে নরম রোদ মেখে ঘরে ফেরার তোড়জোড় করছি ।পাহাড়, অরণ্য, মেঘ ও কুয়াশার দেশ থেকে ফিরে যাবো ইট আর কংক্রীটের জঙ্গলে । প্রতিবারের মতন এবারেও মন খারাপ হয়ে গেল । শ্যাওলা মাখা ভেজা ভেজা পাথরের সারিকে সন্তর্পনে পাশ কাটিয়ে নেমে গেলাম খাদের দিকে । নিচে একটি টোডা গ্রাম আছে । মিঠে সুর ভেসে আসছে - !

ঝিরিঝিরি হাওয়া দিচ্ছে - পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ফুলগুলি সেই সুরের তালে তালে দুলে দুলে উঠছে ।আমি মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকি !

হঠাৎ সেই ছন্দে পতন ঘটিয়ে কর্তার ডাকে ওপরে উঠে এলাম । মালপত্তর তোলা হয়ে গেছে - গাড়ী রেডি । এবার গৃহাভিমুখে যাত্রা শুরু হবে । ফেরার পথে প্রাণ ভরে উপভোগ করলাম পাহাড়ের নৈ:শব্দ্য !

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি- খুব শীঘ্র'ই আবার আসবো-

মৌন নীলপাহাড় যখন ডাকে, হাতছানি দেয় ... তাকে উপেক্ষা করা কি আমার মতন ভ্রমণপ্রেমীর পক্ষে সম্ভব ? পাঠকেরা কি বলেন ?

জানা গেলো যে ইউক্যালিপটাস গাছের নাম নীলগিরি তাই কি এই পাহাড় নীলগিরি ??

ক্লাব মহিন্দ্রার ড্যানিশ ভিলাতে আজ আর কেউ থাকেনা । ভূতের ভয়ে কিনা জানা নেই । ওরা অন্য বাড়ি তৈরি করেছেন !!!!

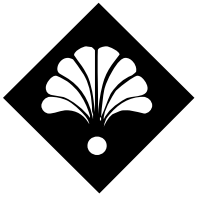

সোনা হাওয়ায়

মেলবোর্নের মাছঘরে একটা দিন কাটালাম। দিনটা ছিলো ২০১০ সালের ডিসেম্বরের কোন একদিন। এক বর্ষণ মুখর শনিবারে আমি ও পতিদেব সুদূর একটি শহর থেকে ট্রেনে করে এলাম মেলবোর্নে।

এক ঘন্টা লাগলো।

সুন্দর খামারবাড়ি ও অশ্বারোহী পর্বত পেরিয়ে আমরা পৌঁছালাম মেলবোর্নের একটি স্টেশানে। নেমে কফি খেয়ে কিছুদুর যেতেই এলো মাছ ঘর। ভেতরে গিয়ে টিকিট নিয়ে দেখতে হবে অ্যাকরিয়াম। বিরাট বড় বড় কাচের ঘর। সেখানে দৌড়ে বেড়াচ্ছে স্টিং রে, রঙীন মাছ, ছোট স্কুইড, নানান বড় বড় মাছ এক একটি সাইজে মানুষের থেকে অনেক বড় নির্লিপ্ত ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এত যে মানুষজন এত জন-বিস্ফোরণ চারপাশে তাতে ওদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। স্মার্টলি ঘুরছে ফিরছে। নিজেদের মধ্যে কথোপকথন করছে। এক একটি মাছ এত্তো সুন্দর যে চোখ ফেরানো দায়। বিভিন্ন জায়গায় ওদের জীবনপঞ্জী ও দিনলিপি লেখা আছে। কখন ঠিক কী করে ইত্যাদি। জলের মধ্যে অনেক কোরাল, সামুদ্রিক পাথর ও ভাসমান শ্যাওলা রয়েছে। ঠিক যেমন হয় সমুদ্রের নিচে। এত দৃষ্টি নন্দন যে বলার না। মনে হয় চেয়ে চেয়ে দেখি। যেন কিছুটা সমুদ্র কেটে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ঘরের মধ্যে। এই নাহলে বিদেশ! মায়ের কাছে শুনেছি আমেরিকাতেও এইরকম অ্যাকরিয়াম আছে যা উনি দেখে এসেছেন।

অ্যাকরিয়ামে জিনিসপত্র কেনাকাটা করার জন্য সুন্দর দোকান আছে। আমি মাছের মতন পেন (যদিও খাতায় লেখার অভ্যাস চলে গেছে) কিনে আনলাম মমেন্টো হিসেবে। আমার বাড়িতে একটি কাচের জারে অনেক ঝিনুক আছে, আমার স্বামী যখন মিসাইল লঞ্চে যেতেন (কম্পিউটার বিজ্ঞানী হিসেবে) তখন বিভিন্ন সমুদ্রতীর থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন, আমি এই পেনটি সেখানে সাজিয়ে রাখলাম।

স্ন্যাক বারে কিছু খেয়ে নিলাম। অ্যাকরিয়ামে ঘোরার সময় মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছিলো সমস্ত সামুদ্রিক জীব। পুরোটাই কাচের কিনা। জানা গেলো জলেও নামা যায়। একটি বিশেষ পোশাক পরে নেমে যেতে হবে চারপাশে ঘুরবে শার্ক, অক্টোপাস ইত্যাদি। স্টিং রে খুব বিষাক্ত। ওর লেজের ঝাপটায় মানুষ ভ্যানিশ। মেলবোর্ন অ্যাকরিয়ামের ভাষায় বা বিজ্ঞাপনে : Dive in at the deep end for the ultimate challenge. Your thrilling underwater guided tour will bring you face-to-face with Grey Nurse and Sandbar Whaler Sharks, Giant Stingrays and hundreds of exotic fish. এই যাত্রায় ঐ ট্রিপ নেওয়া গেলোনা কারণ কোনো অজ্ঞাত কারণে তা বন্ধ ছিলো। বেশ ভালো ব্যবস্থা।

আমরা যাঁরা ডুবুরী নই তাঁদের সমুদ্রের তলদেশ দেখার এর চেয়ে ভালো উপায় আর কি হতে পারে ?

আমি পরিবেশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার সময় দেখেছি সমুদ্রের তলায় কি সুন্দর একটি জগৎ আছে। আমাদেরই মতন ওরাও। আমি বাচ্চাদের একটি গল্প লিখেছি তাতেও ওদেরকে হাইলাইট করেছি এবং সেটা মেলবোর্নের মাছঘর দেখার পর। কথা আছে গল্পটি জয়ঢাক পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। দেখা যাক। শুভস্য শীঘ্রম !!

মেলবোর্ন সমুদ্রের ধারে। আমার বাড়িও সমুদ্রের কাছে। জল এত স্বচ্ছ যে সমস্ত চলমান জীব ও সিনানরত সিগাল পাখির পা দুখানি দেখা যায়। আছে একটি জেটি। সেখানে সূর্যাস্তের রঙ মেখে ভেসে আসে লক্ষ লক্ষ মাছ। সাহেবরা মাছ ধরতেই ব্যস্ত। ওঁরা জানে জীবনকে কীভাবে উপভোগ করতে হয়।

আমার বাড়ি থেকে মেলবোর্নের এই অ্যাকরিয়াম এর জায়গাটা দেখা যায়। আর দেখা যায় শয়ে শয়ে রং বেরং এর জাহাজ। প্রতিদিন। ভেসে চলেছে কোন সে অজানায়। এই মাসেই যাবো টাসমানিয়া বেড়াতে। ইস্টারের ছুটিতে। ওটিও একটি সবুজ দ্বীপ। দেখি সবুজ দ্বীপের রাজার সন্ধান পাই কিনা ! মাছঘরের উল্টোদিকে এক টুকরো হিমালয়। অর্থাৎ আমার

প্রাণাধিক প্রিয় নেপালের রেস্তোরাঁ । যাওয়া হয়নি । যেতে হবে । এই আশা নিয়ে বসে আছি ।

যেখানেই যাই না কেন পিছু ছাড়েনা মোর --- হিমের আলয় -মন করে উসখুস, প্রাণ আনচান যতই থাকুক সুন্দরী কোরাল রিফ, সমুদ্র বলয় ।

About Gurkhas Express City - Flinders Street (INFO and text from : INTERNET) It was a humble beginning. Gurkhas Brasserie is one of the first Nepalese restaurants in Melbourne. When Gurkhas Brasserie first opened in 1995 in famous Chapel Street in Melbourne, it had one main purpose: to serve Australian public an authentic taste of Himalayan kingdom of Nepal. Over the time, it lived up to its purpose winning their customers praise and admiration, not just heir taste buds. Gurkhas is now one of the most famous Nepalese restaurants in Melbourne still serving the same taste of Himalayan cuisine but of course with added smile.

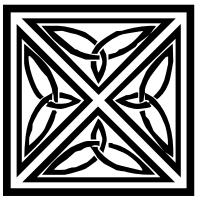

THE END